ক্ষুদ্র-স্মৃতি

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রিয় বিশু !

আজ ঠিক ছয় মাস হইল, উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম অর্ঘ্য লইয়া মাতৃ মন্দিরে কম্পিত হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন কে ভাবিয়াছিল আমার সে ক্ষুদ্র ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি মায়ের চরণে স্থান পাইবে ? কিন্তু মা যে আমার করুণাময়ী,—ভক্তের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি তাহার নিকট কি কখন হতাদরিত হইতে পারে ? —না—। মা আমার ভক্তি অর্ঘ্য তাহার চরণ প্রান্তে গ্রহণ করিয়াছেন। উপন্যাস প্রি. পাঠকপ.ঠিকার অনুকম্পায় আমার সাধনা সার্থক হইয়াছে। তুমি আমার প্রত্যেক পুস্তক সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আগ্রহের সহিত পাঠ কর,—আমার পুস্তক তোমার নিকট অমূল্য, তাই লক্ষ্মী-হীনের বড় সাধের,—বড় আদরের "ঘরের লক্ষ্মী" তোমারই নামের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া দিলাম। কাল তোমায় আমায় সকলকেই সময়ে ধরার কোল হইতে চিরদিনের মত অজানা অচেনা দেশে লইয়া যাইবে কিন্তু যতদিন ভাষা থাকিবে, ততদিন তোমার ভালবাসার স্মৃতি আমার এ "ঘরের লক্ষ্মী" বুকে করিয়া ধরিয়া রাখিবে। ইতি—

৫ই বৈশাখ, ১৩২৪।
কলিকাতা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

সুবিখ্যাত

চিত্রকর শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

চিত্র-সন্নিবেশিত ।

৬২।২।১ নং বিডন ষ্ট্রীট, "সাহিত্য-সঙ্ঘ প্রেস" হইতে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

প্রাপ্তিস্থান—

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,

অন্নদা বুক-ষ্টল

৭৮।২ হ্যারিসন রোড,

কলিকাতা ।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

ঘরের লক্ষ্মী

প্রকাশক

শ্রীফণীভূষণ ঘোষ

২৪।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বৈশাখ, ১৩২৪

ঘরের লক্ষ্মী

প্রথম পরিচ্ছেদ

হরিচরণ প্রত্যূষে উঠিয়া তামাকটি সাজিয়া সবেমাত্র টানিতে যাইতে ছিলেন, সেই সময় পাঁড়েজি আসিয়া সংবাদ দিল,—"বাবুজি আপ্‌কো বোলাতা হায়।"

সহসা এই শুভ সংবাদটায় হরিচরণের হাতের হুকাটা হাতেই রহিল,—তিনি তাঁহার ওয়াড় শূন্য মলিন তাকিয়াটায় ঠেস দিয়া বসিলেন। তাঁহার মনে হইল উষারাণী যেন সহসা লজ্জায় নববধূর ন্যায় জড়সড় ভাবে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া একটা বিরাট আঁধার আনিয়া তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ধরিল। পক্ষীর প্রভাত-কাকলী তাঁহার কর্ণে যেন বেসুরা হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ পাঁড়েজির মুখের

দিকে চাহিয়া, একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিযা বলিলেন,— "পাঁড়েজি, কি ব'ল্লে,— দুর্লভবাবু আমাকে ডাকছেন ?"

পাঁড়েজি তাহার বিরাট ভোজপুরী দেহটাকে বার দুই নাড়িয়া বলিল,—হাঁ হুজুর,—বাবুতো আপকো আভি বোলাতেহে।"

হরিচরণ শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা তুমি যাও—আমি এখনি যাচ্ছি।"

পাঁড়েজি চলিয়া গেল। হরিচরণ আর একবার উঠিয়া বসিলেন,—হুকাটা আর একবার টানিবার চেষ্টা করিলেন ;— কিন্তু গুর্খা সেনার, দুই পার্শ্বে খুকরী চালাইয়া দলিত পেষিত করিয়া আক্রান্তের কেল্লা অধিকারের মত দুশ্চিন্তারাশি মার মার শব্দে এমনি ভাবে তাঁহাব মগজ দখল করিয়া বসিল যে, তাঁহাকে আর হুকা টানিতে হইল না ; তিনি হুকাটা দরজার এক পার্শ্বে রাখিয়া একেবারে চিৎ হইযা শুইয়া পড়িলেন।

দুর্লভ মিত্র তাঁহার পত্নীর শ্রাদ্ধের পর সমস্ত কাজ কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া এই এক বৎসর কাল বিদেশে বিদেশে ঘুরিতেছিলেন, কেবল এক সপ্তাহমাত্র কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। সহসা প্রত্যূষে তাঁহার তলব পাইয়া হরিচরণের প্রাণটা যেন কাঁপিতে লাগিল। আজ ছয় বৎসর তাঁহার নিকট বাড়ী বন্ধক পড়িয়াছে, এ পর্য্যন্ত ছয় পয়সাও তিনি সুদ দিতে

পারেন নাই। তিনি চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, যেন ভিটা ছাড়া হইয়া, কন্যা দুইটীর হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইয়াছেন। তাহার ভিতরের অন্তরাত্মাটা যেন একটা বীভৎস বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। তাঁহার এক পয়সাও নাই; তিনি কেমন করিয়া দুর্লভ মিত্রের ঋণ পরিশোধ করিবেন,—আর সেই বা কত দিন এরূপ ভাবে তাহার টাকা আবদ্ধ করিয়া রাখিবে! দুর্লভ মিত্রের তলব পাইয়া অধিক্ষণ শুইয়া থাকিতেও হরিচরণের সাহস হইল না, তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন; মনে মনে বলিলেন,—"ভগবান্ পোড়া অদৃষ্টে এত দুঃখও লিখেছিলে।"

স্পন্দিত হৃদয়ে হরিচরণ দুর্লভ মিত্রের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। দুর্লভবাবু তখন তাঁহার সরকারকে কেন চারি পয়সা সুদ ছাড়িয়া দেওয়া হইল, তাহারই জন্য মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছিলেন। বেচারী বেতন ভোগী সরকার তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কম্পিত কলেবরে জড়িত কণ্ঠে অতি মৃদুস্বরে বলিতেছিল,—"আজ্ঞে একেবারে সব টাকাটা চুকিয়ে দিলে—"

দুর্লভ মিত্র গর্জ্জিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"দশহাত মাটি খুড়লে জল পাওয়া যায়, টাকা পাওয়া যায় না—বুঝ্‌লে। চার পয়সা! চার পয়সা আসে কোথা থেকে হে?"

সেই সময়ে হরিচরণকে বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া দুর্লভ মিত্র একবার মাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া বসিতে

ইঙ্গিত করিলেন ;—তাহার পর আবার তেজারতি কারবারের খাতা পত্র দেখিতে লাগিলেন। দুর্লভ মিত্রের গম্ভীর ভাব ও তর্জ্জন গর্জ্জন দেখিয়া হরিচরণের কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল। সরকারের পরই তাহার পালা, এই কথা ভাবিয়া তিনি ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। প্রলয় সাগরের তীরে আসিয়া দাঁড়াইলে মানুষের অবস্থা যেরূপ হয়, মৃত্যুর দিন জানিতে পারিলে জীবিতের অবস্থা যেরূপ দাঁড়ায়, আজ হরিচরণের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি ধীরে ধীরে যাইয়া ফরাসের একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এইভাবে অতিবাহিত হইবার পর সহসা খাতা পত্র বন্ধ করিয়া দুর্লভ মিত্র, হরিচরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"দেখ বাপু, আমার স্ত্রীর শেষ ইচ্ছাটা আর অসম্পূর্ণ রাখবোনা, তোমার মেয়ের সঙ্গেই আমার বড় ছেলের বিয়ে দেব। যদিও এতে আমার সম্পূর্ণই লোকসান। তুমি তোমার মেয়ের বিয়েতে যা লাক পঞ্চাশ খরচ ক'র্ব্বে তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে, কিন্তু কি আর ক'চ্ছি বল, তার আর চারা নেই—কিছু লোকসান হবে তা ব'লে আর কচ্ছি কি? আসছে রোববার সন্ধ্যার পর আমি তোমার মেয়েকে দেখতে যাব। ছেলে বেলায় যদিও তাকে দুই একবার দেখিছি, কিন্তু সে দেখাতো আর

দেখা নয়—রীতি যা তা ক'র্ত্তেই হবে ; তারপর একটা ভাল দিন দেখে যত শীঘ্র হয় দুই হাত এক ক'রে দেব !"

হরিচরণ এতক্ষণ নীরবে বসিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দুর্লভ মিত্রের কথাগুলা যেন গিলিতেছিলেন। তিনি কি উত্তর দিবেন ? কোথায় বাড়ী নিলামের ক্রোকী পরোয়ানা, আর কোথায় ধনকুবের দুর্লভ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ ! তিনি কেবল মাত্র বলিলেন,—"আজ্ঞে আপনার দয়ায়ই বেঁচে আছি। শোভা আপনার পুত্রবধূ হবে এর চেয়ে আমার আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে ?"

দুর্লভ মিত্র অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"হুঁ ! এখন তা হ'লে যেতে পারো, আমার ঢের কাজ। রবিবার সন্ধ্যার পরই যাবো।"

দুর্লভ মিত্র অধিক কথার লোক ছিলেন না, কাজের কথা ভিন্ন বাজে কথা বড় একটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইত না। কেহ কখন তাঁহার সম্মুখেও বাজে কথা কহিতে সাহস করিত না। হরিচরণ তাহা বিশেষ ভাবেই জানিতেন ; তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে একটি নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে দুর্লভ মিত্রের বৈঠকখানা পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দুইখানা প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে পড়িয়া হরিচরণের ক্ষুদ্র বাড়ীখানা ঐশ্চর্য্যের ধমকে একেবারেই খাটো হইয়া গিয়াছিল। একদিকে দুর্ল্ভ মিত্রের প্রকাণ্ড সাদা সৌধখানা ক্রমেই আসে পাশে উচ্চে বেপ্যাটেন ভাবে বাড়িয়া আকাশ স্পর্শ করিবার উপক্রম করিতেছিল; অন্য দিকে অঘোর বোসের লাল পয়েণ্টিং করা অট্টালিকাখানি নানাভাবে সজ্জিত হইয়া ঠিক যেন একখানি ছবিতে পরিণত হইয়া উঠিতেছিল। এ অবস্থায় হরিচরণের জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুদ্র বাড়িখানি যে এত দিনও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল, ইহাতেই সে যেন গর্ব্বে আপনা হইতেই ফাটিতে আরম্ভ করিয়া ছিল।

সুখে দুঃখে বড়লোকের ছাওয়ায় থাকিয়া হরিচরণের দিন গুলি একরূপ কাটিয়া যাইতে ছিল কিন্তু সহসা বিধাতার বক্র-দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইল। সে আজ দশ বৎসরের কথা, প্রায় এক বৎসর কাল কঠিন রোগে শয্যাশায়ী থাকিয়া ডাক্তারী চিকিৎসা, বায়ু পরিবর্ত্তন, জল ভ্রমণ প্রভৃতিতে

সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, দুইটি শিশু কন্যার ভার চাপাইয়া হরিচরণের পত্নী হরিচরণের কোলে মাথা রাখিয়া চিরদিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; হরিচরণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পত্নীর চিকিৎসায় যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহাতো গেলই, অধিকন্তু বাড়িখানি পর্য্যন্তও বন্ধক পড়িল। হরিচরণ একটু শোক করিবারও অবসর পাইলেন না, মাতৃহারা কন্যা দুইটির করুণ ক্রন্দনে তাঁহার বক্ষপঞ্জর কে যেন সবলে নাড়িয়া দিল,—তিনি সাগ্রহে তাহাদের বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

তাহার পর সাত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, হরিচরণের জ্যেষ্ঠা কন্যা শোভা এক্ষণে তের বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। এই সাত বৎসর কত বিপদাপদের ভিতর দিয়া হরিচরণ তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহটুকুতে ঘিরিয়া বহু কষ্টে কন্যা দুইটিকে জীবিত রাখিয়াছেন। তের বৎসরের শোভা ও নয় বৎসরের প্রভা এক্ষণে শোভা ও প্রভারূপে তাঁহার জরাজীর্ণ ক্ষুদ্র বাড়ীখানি আলোকিত করিতেছে। তাঁহার সমস্ত দুঃখ যাতনার এই কন্যা দুইটীই এক্ষণে শান্তি প্রলেপ হইয়াছে। এই মাতৃহারা কন্যা দুইটির এমনি একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, যে তাহাদের দেখিত, সেই তাহাদের ভালবাসিত, যত্ন করিত, অপরিসীম স্নেহে ডুবাইয়া দিত। আনন্দে হরিচরণের চক্ষে জল আসিত।

ঘরের লক্ষ্মী

সে দিন রবিবার, আফিস বন্ধ। আহারের পর হরিচরণ তাঁহার জরাজীর্ণ বাটীর ক্ষুদ্র বৈঠকখানার ভগ্ন তক্তপোষখানির উপর আড় হইয়া পড়িয়া একটু তন্দ্রা দিতেছিলেন, সহসা বিশ্বনাথের, "ভায়া ওঠো বেলা যে যায়," শব্দে তিনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিলেন, দুই হস্তে চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলেন,—"বস, বিশ্বনাথ, হঠাৎ একটু তন্দ্রা এসেছিল।"

এই বিশ্বনাথটি হরিচরণের বাল্যবন্ধু। সংসার তরঙ্গে পড়িয়া অনেক বন্ধুই ভাসিয়া গিয়াছে,—অনেকে পৃথিবী হইতেই একেবারে অবসর গ্রহণ করিয়াছে;—যাহারা আছে তাহারা নিজের ঝঞ্ঝাট লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, কে কাহার সংবাদ লয়! কিন্তু বিশ্বনাথ প্রত্যহ অন্ততঃ একাবারও হরিচরণের বাড়ী আসিত,—দুই বন্ধুতে বসিয়া সুখ দুঃখের কথা কহিয়া কতকটা যন্ত্রণার লাঘব করিত। বিশ্বনাথ সংসার সমুদ্রে অনেক হাবুডুবু খাইয়াছে,—অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছে। উপর্য্যুপরি তরঙ্গের পর তরঙ্গের ধাক্কা খাইয়া খাইয়া শেষে সে একেবারে চড়ায় আসিয়া উঠিয়াছে,—আর কোন চিন্তা নাই,—আর কোন দুর্ভাবনা নাই,—আর তাহার চিত্তাকাশে কালমেঘ ঘনাইয়া আসে না;—এক্ষণে তাহা অরুণরাগ রেখার মত পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন। এই বিস্তৃত পৃথিবীতে থাকিবার মধ্যে ছিল তাহার এই বাল্যবন্ধু হরিচরণ, আর চির প্রিয়

তামাক। এই দুইটি জিনিষের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও একটি না হইলে বিশ্বনাথের চলিত না। বলিবার পূর্ব্বেই বিশ্বনাথ তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিয়াছিল; সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভায়া আজ না তোমার মেয়ে দেখ্‌তে আসবে? আর তুমি দিব্বি নিদ্রা দিচ্ছ?"

বহুদিন পরে হরিচরণ আজ মহা শান্তিতে বিভোর হইয়া নিদ্রায় শত সহস্র সুখ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। বিশ্বনাথের কথায় তাঁহার খেয়াল হইল। সত্যই যে আজ সন্ধ্যার পর শোভাকে দেখিতে আসিবে। কন্যা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে কন্যাটিকে সুপাত্রে অর্পণ করিবেন, সেই চিন্তাই হরিচরণের প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন,—বিনা চেষ্টায় আপনা হইতেই প্রজাপতির দুই পক্ষ নড়িয়া উঠিয়াছে। আজ দুর্লভ মিত্র তাঁহার ক্ষুদ্র বাড়ীতে পদার্পণ করিবে,—শোভা দুর্লভ মিত্রের পুত্রবধূ হইবে,—হীরা জহরতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া যাইবে। ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে থাকিয়া মা আমার ঐশ্বর্য্যের রাণী হইবে, এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতেই হরিচরণের একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল,—তন্দ্রায়ও তিনি তাহারই সুখ-স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন,—সহসা বিশ্বনাথের ডাকে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। গৃহের এক কোণে বসিয়া কয়েকটি মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাঁড়ী কড়া

লইয়া প্রভা একটি ক্ষুদ্র খেলাঘর পাতিয়া আপন মনে কত কি রাঁধিতেছিল। হরিচরণ কন্যাব দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"যাতো মা প্রভা, তোর দিদিকে ডেকে আন্‌তো।"

• নবমবর্ষীয়া প্রভা গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমি যে ভাত চাপিয়েছি বাবা—উনুনে যে আঁচ, কেমন ক'বে ফেলে যাবো,—এখনি সব পুড়ে যাবে।"

বিশ্বনাথ মৃদু হাসিযা বলিল,—"বেটি বেজায় গিন্নী হ'য়েছে।"

হরিচরণ বলিলেন,—"যা মা ততক্ষণ তোব বিশ্বনাথ খুড়ো ভাত দেখ্‌বে এখন।"

"দেখ যেন পুড়ে যায না,"—বলিযা প্রভা ছুটিযা বাটীব ভিতব চলিযা গেল, বিশ্বনাথ বলিল,—"ভাযা এক ছিলেম তামাক চড়াও।"

তক্তপোষের নিম্নে কযেকটি কলিকাতে তাম্রকূট সাজা ছিল,—হরিচরণ তাহারই একটি আনিযা বিশ্বনাথের হস্তে দিলেন; বলিলেন,—"ধরাও।"

বিশ্বনাথ কলিকায় হাওযা দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"ভায়া ছেলেটি কি রকম বুঝ্‌ছ? মেয়ে সুখে থাক্‌বে তো?"

হরিচরণ একগাল হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"বিশ্বনাথ, তুমি আমাকে একেবারে অবাক করেছ। দুর্লভ মিত্রের ঘরে

পড়ছে,—মেয়ে সুখে থাকবে কি না তাই আবার জিজ্ঞাসা কচ্ছ! আর ছেলে একেবারে কার্ত্তিক বললেই হয়,—সেতার, ইস্‌রাজ, হারমোনিয়াম এমন কি বাঁয়া তবলা পর্য্যন্ত বাজাতে পারে! তবে লেখা পড়ায় একটু খাটো,—তা বড় লোকের ছেলে মাত্রই একটু সে বিষয়ে কাঁচা হ'য়ে থাকেই। আর তার লেখা পড়ার দরকারই বা কি,—টাকা গুণতে পারলেই হলো। জানইতো দুর্লভ মিত্র একটি টাকার পর্ব্বত বল্লেই হয়।"

বিশ্বনাথ হুকায় কলিকা বসাইতে বসাইতে কহিল,—"ভায়া মনের সুখ তো আর টাকায় হয় না,—সে সুখে চাই প্রাণের মিল। শুনতে পাই দুর্লভ মিত্রের ছেলে দুটি না কি একেবারে জাহাজী গোরা,—তেজচন্দ্রের নাতি। বিদ্যা-বুদ্ধির নাম নেই; এদিকে বাহিরে চটক দেখে কে? ইয়া পাঞ্জাবী, ইয়া টেরী, ইয়া ফপ্‌চেন। তার উপর বিধবা কন্যা রত্নটির যেরূপ মুখ মিষ্টি শুনতে পাই, তাতে আমার যেন, কেমন মনে হয়।"

হরিচরণ বিশ্বনাথকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"সব কাজেই তোমার এই, কেমন মনে হয়; দেখি গোল বাধায়। এই কেমন মনে হয়টা ছাড়ো। বড় লোকের ছেলেরাই ফপ্‌চেন পরে,—টেরীও কাটে। সব জিনিষ তুমি তলিয়ে বোঝ না, বিশ্বনাথ এইটুকুই তোমার দোষ।"

তামাক তখন ধরিয়া উঠিয়াছিল, বিশ্বনাথ এক গাল ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল,—"কিন্তু তা ভায়া তুমি যাই বল,—আমার কেমন মনে—"

হরিচরণ স্বর একটু উচ্চে তুলিয়া বলিলেন,—"আবার কেমন মনে,—নাও রাখ তোমার কেমন মনে—"

সেই সময় প্রভা তাহার দিদির হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বৈঠকখানা গৃহে আনিয়া হাজির করিল। কিশোর ও যৌবনের মধ্যে পড়িয়া শোভা শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর পুণ্যের দীপ্তি লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রূপের সমুদ্র যেন তাহার অনন্ত তরঙ্গ তুলিয়া বালিকার সমস্ত অঙ্গে ছাপাইয়া পড়িতেছিল। এলোমেলো একরাশ কালচুল তাহার পৃষ্ঠের উপর গড়াইয়া পড়িয়া বায়ুভরে উড়িয়া আসিয়া তাহার টুকটুকে ঢলঢলে মুখখানি ঢাকিয়া দিতেছিল। শোভা চুলগুলি মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া মৃদু হাসিয়া মধুরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা,—ডাকৃছ কেন?"

কন্যাদ্বয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া হরিচরণ কথাটা শেষ না করিয়াই নীরব হইয়া ছিলেন;—কহিলেন,—"যাতো মা, চট্ করে তোর নীহার দিদির কাছ থেকে চুলটা বেঁধে আয় তো। আজ যে তোকে দেখ্‌তে আসবে।"

প্রভা তাড়াতাড়ি বলিল,—"চ' দিদি, তোকে সাজিয়ে

নিয়ে আসি,—সেজেগুজে না থাক্‌লে শেষে আবার অপছন্দ কর্‌বে।”

শোভা ঠাস্ করিয়া তাহার ছোট বোনের গণ্ডে একটা চপেটাঘাত করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। প্রভা প্রথমে এক-বার, “দেখ না বাবা, দিদি আমায় মার্‌লে,” বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে তাহার চোখ মুছিতে মুছিতে দিদির অনুসরণ করিল। বিশ্বনাথ বলিল, “ভায়া তোমার মেয়েকে আর সাজাবার দরকার হয় না। ভগবান্ নিজে হাতে ওকে যে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। এ মেয়ে যার ঘরে পড়্‌বে তার ঘর আলো হ'য়ে যাবে।

হরিচরণ গদগদকণ্ঠে কেবলমাত্র বলিলেন,—“বিশ্বনাথ, মা যে আমার ঘরেরলক্ষ্মী।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈকালে নীহার তাহার মাতার নিকট বসিয়া শ্বশুরালয়ের গল্প করিতেছিল ও চুল বাঁধিতেছিল। বামুন দিদি ও বাটীর পুরাতন ঝি নফরার মা হাঁ করিয়া তাহাই শুনিতেছিল। নীহারের মাতা বিন্দুবাসিনী বলিলেন,—"জামাই বৰ্দ্ধমানে কবে গেল?"

নীহারের চুল বাঁধা শেষ হইয়া ছিল, সে তখন একখানি ক্ষুদ্র চিরুণীর একধারে সিন্দূর লাগাইতে ছিল। সে সিন্দূর তাহার সিঁথীর মাঝখানে অতি পরিপাটিরূপে সেই চিরুণীর সাহায্যে প্রদান করিয়া, তাহা হস্তস্থিত স্বর্ণমণ্ডিত নোয়ায় একটু স্পর্শ করিল এবং মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"এই শনি-বারের আগের শনিবারে।

মাতা পুনরায় বলিলেন,—"তোকে বৰ্দ্ধমানে নিয়ে যাবে না?"

নীহার মুখখানি ভার করিয়া বলিল,—"হাঁ, আমার শাশুড়ী পাঠাবে কি না।"

নফরার মা জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁগো দিদিমণি, বর্দ্ধমান সে কোন দেশ, সেখানে খাবার জিনিষ মেলেতো ?"

নীহার মৃদু হাসিয়া বলিল,—"সে কি এখানে—সে অনেক দূর। সেখানে খাবার জিনিষ কিছুই পাওয়া যায় না,—সেখানকার লোকেরা শুধু হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকে।"

বিন্দুবাসিনী আবার কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় শোভা তাহার চুল বাঁধিবার সরঞ্জম হস্তে লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নীহার এক গাল হাসিয়া বলিল,—"এই যে শুবি, চুলের দড়িটড়ি নিয়ে হাজির, চুল বাঁধতে হবে বুঝি ?"

প্রভাও তাহার দিদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল, শোঁভা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে তাড়াতাড়ি উত্তর দিল,— "তুমি জান না বুঝি নীহার দিদি,—দিদির যে বে! আজ দেখ্‌তে আসবে, তাই বাবা তোমার কাছে দিদিকে চুল বাঁধ্‌তে পাঠিয়ে দিলে। খুব ভাল ক'রে চুল বেঁধে দাও। বর যেন পছন্দ করে।"

শোভা রাগিয়া বলিল,—"তোকে আর জ্যাঠামি ক'র্‌তে হবে না, সব কথায় মেয়ের কথা।"

এত লোকের মধ্যে কথার সূচনাতেই ভগিনীর নিকট ধমক খাইয়া প্রভা বড়ই অপ্রস্তুত হইল, তাহার চোক দুইটি

ছল ছল করিয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী তাহা লক্ষ্য করিলেন,—তিনি এই মাতৃহারা কন্যা দুইটিকে বড়ই ভাল বাসিতেন, সর্ব্বদাই তাহাদের কাছে কাছে রাখিতেন। তিনি নিজে ইহাদের কখনও পর বলিয়া ভাবিতেন না বলিয়াই এই বালিকা দুইটিও তাঁহাকে মায়েরই মত দেখিত। সকলেই জানিত, ইহারা বিন্দুবাসিনীর বিশেষ স্নেহের পাত্রী। ইহা ব্যতীত প্রফুল্লনাথ ইহাদের নিজের ভগিনী নীহারের অপেক্ষা কম ভাল বাসিতেন না। তাহাদের কোন আব্দারই কোন দিন তাঁহার নিকট হতাদৃত হয় নাই। মাতৃহারা হইবার পর এই বালিকা দুইটি এই বাড়ীতেই মানুষ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শোভা অপেক্ষা নীহার কেবল মাত্র দুই বৎসরের বড়, তাহাদের দুইজনের গলায় গলায় ভাব। এখন দুই বৎসর পূর্ণ হয় নাই নীহারের বিবাহ হইয়াছে। বিন্দুবাসিনী অতি কোমল স্বরে বলিলেন,—"চ' প্রভা আমরা এখান থেকে যাই,—চল তোর প্রফুল্ল দাদাকে খাবার দিয়ে আসিগে।"

বিন্দুবাসিনী প্রভাকে লইয়া পুত্রের গৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন, বামুনদিদি ও নফরার মা গৃহের কাজকর্ম্ম সারিবার জন্য নিম্নে নামিয়া গেল। মাতা প্রস্থান করিলে নীহার বলিল,—"ওমা আজ বুঝি রবিবার, মাইরি ভাই

আমি একেবারেই ভুলে গেছ্‌লুম। তা একটু সকাল সকাল আস্‌তে নেই বুঝি, মেয়ে যেন কেমন!"

নীহার তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স নামাইল ও শোভাকে টানিয়া সম্মুখে বসাইয়া তাহার চুল খুলিতে আরম্ভ করিল। চুল খোলা শেষ হইলে সে তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স খুলিল। বাক্সটিতে যে কি নাই তাহা বলা কঠিন। পাউডার, এসেন্স, সুগন্ধি তৈল, চিরুণী, ফিতা, কাঁটা, জরি, পাশাপাশি সজ্জিত রহিয়াছে। চুল বাঁধিবার যাহা কিছু আবশ্যক তাহারই সরঞ্জমে বাক্সটি পরিপূর্ণ। এই বাক্সটি বিবাহের সময় তাহার দাদা তাহাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। নীহার বড়লোকের কন্যা, বড়লোকের পুত্র-বধূ হইয়াছে; বেশভূষা সাজ সজ্জার কোন সামগ্রীই তাহার অভাব ছিল না। সম্প্রতি তাহার স্বামী ডিপুটী হইয়া বর্দ্ধমানে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাহার সর্ব্বাপেক্ষা গর্ব্বের বস্তু ছিল, তাহার দেবতার ন্যায় সহোদর প্রফুল্লনাথ। সরল উদার দাদার এত অসীম স্নেহ নীহার পাইয়াছিল, যাহা সত্যই সংসারে বিরল,—হিংসার সামগ্রী।

সে আজ বহুদিনের কথা, বিন্দুবাসিনী একটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন। বিন্দুবাসিনীর স্বামী

ঘরের লক্ষ্মী

অঘোরবাবু কলিকাতার এক সওদাগরী আফিসে মুচ্ছুদ্দীর কার্য্য করিয়া পিতৃধন ব্যতীত বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র মালিক প্রফুল্লনাথ। প্রফুল্লনাথ লোকটি বড় সৌখিন। নানাবিধ সৌখীন আসবাব ও গৃহ সজ্জাদির দ্বারা তিনি তাহার বাড়ীখানি ঠিক যেন একখানি ছবিতে পরিণত করিয়াছিলেন। ঘরগুলি মারবেল মণ্ডিত, প্রাচীর গাত্রে উচ্চদরের পেন্টিং করা, প্রতি গৃহেই বড় বড় আয়না, বৈদ্যুতিক ঝাড়। প্রফুল্লনাথের বয়স এক্ষণে দ্বাবিংশতির অধিক নহে, সবেমাত্র গোঁপের অল্প অল্প রেখা দিয়াছে। ভগবান্ প্রফুল্লনাথকে অনেক বস্তুই দিয়াছিলেন,—যাহা অনেকের ভাগ্যেই কদাচিৎ লাভ হইয়া থাকে। রূপ, স্বাস্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, ঐশ্বর্য্য তাহার কোনটারই অভাব ছিল না। বেশ ভূষার প্রতি প্রফুল্লনাথের আদৌ লক্ষ্য ছিল না, এক যোড়া চটি ও একটা ঝলঝলে পাঞ্জাবীই তাঁহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিত।

একঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমে দুই জনেই ঘর্ম্মাক্ত হইবার পর চুল বাঁধা শেষ হইল। চুল বাঁধা শেষ করিয়া নীহার শোভাকে একবারে টানিয়া লইয়া নিম্নে চৌবাচ্চার নিকট হাজির করিল। শোভা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে

তাহার কোন কথাতেই কর্ণপাত করিল না। তাহার পর সে তাহাকে কলতলায় ফেলিয়া সাবান ও খসড়ায় মাজিয়া ঘষিয়া তাহার গোলাপী রং একেবারে লাল করিয়া দিল। গা ধোয়া শেষ হইলে শোভা সেই ভিজা কাপড়েই বাড়ী যাইতেছিল, কিন্তু নীহার ছাড়িল না বলিল,—"তা বই কি, এখন ওপরে চল, একেবারে কাপড় চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে দিই।"

শোভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না ভাই, আমি বাড়ী গিয়ে কাপড় ছাড়বো।"

নীহার মৃদু হাসিয়া বলিল,—"ও দেখিস্ বরের নামে যে আর তর সইছে না।"

ইহার উপর আর কথা নাই! কাজেই নীরবে নীহারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আবার শোভাকে উপরে উঠিতে হইল। গৃহে প্রবেশ করিয়া নীহার তাহার তোরঙ্গ খুলিল। তাহার ভিতর হইতে একখানি রেশমের বাসন্তী রংয়ের কাপড় ও সেই রংএর একটী জ্যাকেট বাহির করিল। তাহার পর সেই কাপড় ও জ্যাকেটটী শোভাকে পরাইয়া দিয়া তাহার অঞ্চলটী কোঁচাইয়া স্কন্ধের নিম্নে একটী সেপ্টীপিন দিয়া আঁটিয়া দিল। মনে মনে বিশেষ আপত্তি থাকিলেও এতক্ষণ শোভা বহু কষ্টে স্থির হইয়াছিল, কিন্তু যখন নীহার তাহার গহনাগুলি একে

একে খুলিয়া শোভাকে পরাইয়া দিতে গেল তখন সে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না; বলিল,—"না ভাই, আমি গয়না পর্‌বো না।"

নীহার কৃত্রিম ক্রোধভরে বলিল, "নিজের বিয়েতে নিজে আর কেউ গিন্নিপনা করে না, যা লোকে বলে তাই শুন্‌তে হয়।"

শোভা যদিও নানারূপ আপত্তি করিল, কিন্তু তাহার কোন আপত্তিই টিকিল না, নীহার একরূপ জোর করিয়া তাহার গহনাগুলি তাহাকে পরাইয়া দিল। জগৎ তখন রক্তিম বসনে ভূষিত হইয়া গোধূলির আহ্বান সঙ্গীত গাহিতে ছিল, গবাক্ষের ভিতর দিয়া তাহার সেই রক্তিম বসনের প্রতিবিম্ব গৃহের ভিতর প্রবেশ করায় সমস্ত গৃহখানি স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই অপরূপ আলোয়, সেই অপরূপ সজ্জায় শোভাকে ঠিক যেন একখানি জীবন্ত সরস্বতী প্রতিমার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সাজ শেষ হইলে, শোভা বলিল, "হয়েছেতো? আমি ভাই এখন তবে বাড়ী চল্লুম।"

নীহার একগাল হাসিয়া বলিল,—"তা বই কি, আগে চল্, মাকে দাদাকে দেখাই, সাজিয়ে গুজিয়ে কেমন দেখাচ্ছে, তবে তো বাড়ী যাবে।"

শোভা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না ভাই, আমি এ রকম ভাবে তাঁদের কাছে যেতে পার্‌বো না।"

নীহার মহা ভারিক্কের মত বলিয়া উঠিল,—"না, যাবে না বই কি! মাকে প্রণাম না ক'রে আজ বুঝি যেতে আছে?"

এবারেও শোভা পরাস্ত হইল। সত্যই আজ মাকে প্রণাম না করিয়া সে কিছুতেই যাইতে পারে না। বাল্যে মাতৃহারা সে, যাহার মাতৃস্নেহে তাহার ক্ষুদ্র জীবনটুকু কানায় কানায় ভরিয়া রহিয়াছে,—তাঁহার চরণ ধূলি মস্তক স্পর্শ না করিলে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ না পাইলে, তাহার জীবন যে কোন দিনই সার্থক হইতে পারে না।

বিন্দুবাসিনী প্রফুল্লনাথের গৃহে প্রফুল্লনাথের সহিত গল্প করিতে ছিলেন,—প্রভা বিন্দুবাসিনীর কোলটির নিকট জানুটি ঠেস দিয়া বসিয়া তাহাদের কথায় যোগ দিয়া অনর্গল বকিতে ছিল। সেই সময় নীহার একরূপ জোর করিয়া টানিয়া শোভাকে লইয়া সেই গৃহে উপস্থিত হইল। শোভা লজ্জায় একেবারে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল। সে দরজার এক পার্শ্বে মহা সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইল। প্রফুল্লনাথ একবার শোভার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি? বিবি যে আজ একেবারে সরস্বতী প্রতীমা সেজেছে।"

প্রফুল্লনাথ শোভাকে বিবি বলিয়া ডাকিতেন। নীহার দাদার কথার উত্তরে বলিল, "তুমি বুঝি জান না দাদা, শোভার যে বিয়ে,—আজ তাকে দেখ্‌তে আসবে।"

প্রফুল্লনাথ বলিল,—"ও হাঁ হাঁ শুনছিলুম বটে, আমাদের এই দুর্লভবাবুর সঙ্গে হবে,—না ?' তা মানাবে বেশ !"

সান্ধ্যসমীরণ-কম্পিতা বাসন্তীলতার ন্যায় শোভার সমস্ত অঙ্গ ঈষৎ টলিল, বঙ্কিম নেত্রে সে একবার প্রফুল্লনাথের দিকে তীব্রভাবে চাহিল। প্রফুল্লনাথ সে চাহনীর অর্থ অন্তরে অন্তরে বুঝিলেন। বিন্দুবাসিনী বলিলেন,—"বালাই ষাট্ অমন কথা বলিস্‌নি, দুর্লভবাবুর সঙ্গে হ'তে যাবে কেন, তার বড় ছেলে বিনোদের সঙ্গে হবে।"

প্রভা বলিল,—"চল দিদি, আর দেরী ক'রে কাজ নেই ভাই, তারা হয়তো এতক্ষণ এসে পড়্‌লো।"

শোভা বিন্দুবাসিনীর সম্মুখে ধীরে ধীরে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বিন্দুবাসিনী আদরে শোভার চিবুক ধরিয়া চুম্বন করিলেন ; বলিলেন, "বেঁচে থাক,—রাজরাণী হও।"

মাতার আশীর্ব্বাদ-বাণী শুনিয়া প্রফুল্লনাথ বিন্দুবাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "মা বড় কৃপণ। বড় আশীর্ব্বাদ থাক্‌তে ছোট আশীর্ব্বাদ ক'ল্লে।"

পুত্রের কথায় বিন্দুবাসিনীও মৃদু হাসিলেন. বলিলেন,—"এর চেয়ে আবার কি বড় আশীর্ব্বাদ আছে, তাতো বাছা আমি জানিনে।"

প্রফুল্লনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"এর চেয়ে বড়

আশীর্ব্বাদ কি আছে জান না মা,—এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ হ'লো, মনের মত বর হ'ক্।"

বিন্দুবাসিনী পুত্রের কথায় হাসিয়া বলিলেন,—"না হয় সেই আশীর্ব্বাদই করি।"

তাহার পর আবার শোভার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মনের মত বর হ'ক্, ভাগ্যিমানের বউ হও।"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন,—"মা তোমার আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হবে না, বিবির মনের মতনই বর হবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুর্লভবাবু শোভাকে দেখিয়া গিয়াছেন, আজ শোভার পাকা দেখা। দুই বাড়ীতেই বিবাহের আয়োজন খুব প্রবল ভাবেই চলিতেছে। হরিচরণ প্রভাতে উঠিয়াই প্রফুল্লনাথের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। প্রফুল্লনাথ তখন বাটী ছিলেন না। হরিচরণ উঠান হইতেই, "বৌঠান—বৌঠান", বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। নফরার মা উঠানের এক পার্শ্বে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, হরিচরণের চীৎকারে সে ফিরিল; বলিল, "বাবু! মাঠাকরুণ ছাদে পূজোরঘরে আছেন!"

হরিচরণ বিন্দুবাসিনীকে বৌঠান্ বলিয়া ডাকিতেন্। অঘোরবাবু যখন জীবিত ছিলেন তখন হইতেই তাঁহার এই বাটীতে সর্ব্বত্র অবাধ গতি। অঘোরবাবুর সংসারে থাকিবার মধ্যে ছিল, কেবল মাত্র স্নেহের পুত্র, আদরের কন্যা ও প্রাণসমা পত্নী। তাঁহার নিজের আত্মীয় স্বজন অপর বড় একটা আর কেহ ছিল না সেই জন্যই হরিচরণকে তিনি নিজ কনিষ্ট ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন;—প্রফুল্লনাথও হরিচরণকে আপনার খুল্লতাতের

মত ভক্তি ও মান্য করিয়া থাকেন। হরিচরণ উপরে উঠিতে যাইতেছিলেন কিন্তু নফরার মা বাধা দিল—সে তাহার বাসন মাজা বন্ধ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এক গাল হাসিয়া বলিল,—"বাবু! শোভা দিদির বিয়েতে আমার কিন্তু একগাছা ত া চাই।"

হরিচরণের প্রাণ তখন আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। যে ভাবনার কাল মেঘ শোভার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়াকাশে ঘনাইয়া আসিতেছিল, আজ তাহা আনন্দ-ঝটিকায় একবারে নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে,—সে আনন্দের তীব্র জ্যোতিঃ আজ তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া পড়িতেছিল। হরিচরণ বার দুই কাসিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "তা তুই একশোবার চাইতে পরিস, —এ তোর নেহ্য পাওনা। তা পাবি বই কি,—নিশ্চয় পাবি।"

হরিচরণ আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সহসা উর্দ্ধে দৃষ্টি পড়ায় দেখিলেন বিন্দুবাসিনী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি পূজার ঘরেই হরিচরণের চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিলেন। এত প্রত্যুষে হরিচরণ সহসা কেন তাঁহার খোঁজ করিতেছেন জানিবার জন্যেই, তিনি তাঁহার পূজা অর্দ্ধেক অবস্থায় স্থগিত রাখিয়া, পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি হরিচরণকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি

নিয়ে নামিয়া আসিলেন। বিন্দুবাসিনী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই, মাথাটা নাড়িয়া হরিচরণ বলিলেন,—"বৌঠান্! আজ শোভাকে আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে দুর্লভবাবু আসবেন,—খাওয়া দাওয়ার পরই তোমার যাওয়া চাই। শোভার মা নেই,—মনে থাকে যেন তোমাকেই সব কর্ত্তে হবে।"

বিন্দুবাসিনী হাসিয়া বলিলেন,—"সে কি কথা ঠাকুরপো,—শোভা কি আমার পর? নিহীও যা, আমার শোভাও তা। আমাকে আর ব'লতে হবে কেন, আমি নিজেই যাব।"

নীহার আসিয়া মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল,—"কাকাবাবু কই আমাকে যেতে বল্‌লে না?"

হরিচরণ একগাল হাসিয়া বলিলেন,—"তোকে আবার যেতে বলবো কিরে বেটী! তোরই তো বাড়ী। বিয়ে হ'য়ে বেটী আমার বড়লোক হয়েছে। তুই যাবিনি! তুই না-গেলে শোভাকে সাজিয়ে গুজিয়ে দেবে কে?"

নীহার আর কোন কথা কহিল না,—সে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বিন্দুবাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দিতে থুতে কি রকম হবে?"

হরিচরণ বেশ একটু উচ্চৈস্বরে বলিলেন,—"এক পয়সাও নয়! দুর্লভবাবু, বুঝ্‌লে বৌঠান্ মহা সদাশয় লোক।

লোকে যে কেন তাঁর নিন্দা করে তা ভগবানই জানেন। তিনি আমার অবস্থা দেখে এক রকম বিনা পয়সায় তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে সম্মত হয়েছেন। আজ কাল্‌কার দিনে এমন সদাশয় লোক ক'জন হয়? আমার কিছুই খরচ নেই বল্‌লেই হয়, কেবল বরযাত্র খাওয়ান ও ফুলশয্যার খরচা। মনে থাকে যেন, খাওয়ার পরই তোমার যাওয়া চাই।"

হরিচরণকে গমনোদ্যত দেখিয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "একটু বসবে না ঠাকুরপো?"

হরিচরণ মহাব্যস্তভাবে বলিলেন,—"না—এখন আর ব'সতে পারবো না। জানইতো আমাকে একলাই সব কর্ত্তে হবে।"

বিন্দুবাসিনী আর কোন কথা কহিলেন না। হরিচরণ প্রফুল্লনাথের বাটী হইতে বাহির হইলেন। তথা হইতে বরাবর নিজের বাটীতে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিলেন,—দরজার সম্মুখে প্রফুল্লনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হরিচরণকে দেখিয়া প্রফুল্লনাথ দাঁড়াইলেন। হরিচরণ বলিলেন, "শুনেছতো, আজ শোভাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্ত্তে আসবে,—সন্ধ্যার পর তোমার আমার বাড়ীতে উপস্থিত থাকা চাই।"

প্রফুল্লনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"সে কি কাকাবাবু, শোভার পাকা দেখা—আর আমি উপস্থিত থাকবো না?"

হরিচরণ বলিলেন, "তাতো বটেই। শোভাকে তুমিই হাতে ক'রে মানুষ করেছ, বল্লেই হয়। লেখা পড়া শিখিয়েছ, তোমারই যত্নে সে এত বড়টা হ'য়েছে। তা বাবা ভুলনা যেন,—দশজন ভদ্রলোক আসবে, তোমার থাকা বিশেষ দরকার। দুর্লভবাবু আর তোমারই হ'লে এ পাড়ার মাথা।"

"আমার জন্য ভাববেন না কাকাবাবু, আমি ঠিক হাজির থাক্‌বো," বলিয়া প্রফুল্লনাথ একটি নমস্কার করিয়া পাশ কাটাইলেন। হরিচরণও নিজের বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

প্রত্যুষে উঠিয়া পর্য্যন্ত হরিচরণ এক মুহূর্ত্তও স্থির হইতে পারেন নাই। পাগলের মত এলোমেলো ভাবে কাজে ও বিনা কাজে আনন্দে দিশেহারা হইয়া কেবলই ঘুরিতেছিলেন। এতক্ষণে যেন একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া একটা তাকিয়া টানিয়া তক্তপোষের উপরে উঠিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া একাকী মনে মনে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বোধ করি তাহাও তাঁহার অধিকক্ষণ ভাল লাগিল না, তিনি আবার উঠিলেন,—তক্তপোষের নিম্ন হইতে একটি কলিকা বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন,—তাহার পর তাহা হুকার উপরে বসাইয়া পাখার সাহায্যে তাহাতে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কলিকার আগুণ ধরিয়া উঠিল,—বাতাস

তাম্রকূটের মধুর সুগন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। হরিচরণ পাখা-খানা পার্শ্বে রাখিয়া হুকাটা টানিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় নন্দলাল গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

নন্দলাল দুর্লভবাবুর দক্ষিণ হস্ত বলিলেই হয়। দুর্লভ-বাবুর ভালমন্দ সমস্ত কাজেই নন্দলাল আছে। মোসাহেবী করিতে নন্দলালের জোড়া নাই। কেবল মোসাহেবীর দ্বারা এই কলিকাতার বাজারে সুখে তাহার সংসার চলিয়া থাকে। কাজেই তাহার যে ক্ষমতা অসীম একথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সহসা নন্দলালকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া হরিচরণের আর হুকা টানা হইল না,—তিনি দ্বারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আরে এস এস,—নন্দলাল বাবু এস। তারপর এ অসময়ে,—খবর কি ? বস বস,—তামাক খাও।"

নন্দলাল তক্তপোষের একধারে বসিতে বসিতে বলিল,—"আজ্ঞে খবর খুব ভালো, যা কেউ কখন ভাবেনি তাই,—আপনার বরাত জোর, বৃহস্পতির দশা। হরিচরণবাবু কর্ত্তার মত ফিরেছে—"

হরিচরণ বিস্মিতের ন্যায় বলিলেন, "কপাল জোর,—মত ফিরেছে, এ সব বলছো কিহে ?"

নন্দলাল হাসিতে হাসিতে বলিল "আজ্ঞে বলবার মত

হ'লেই ব'লতে হয়। দুর্লভবাবুর শ্বশুর হওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা! একি যার তার বরাতে হয়!"

নন্দলালের এ হেঁয়ালীরও বিন্দু বিসর্গ হরিচরণ বুঝিতে পারিলেন না। তিনি অতি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার কথার আমি কোন অর্থই বুঝতে পারছিনি,—ব্যাপার কি ছাই ভেঙ্গেই বল না?"

নন্দলাল বেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিল,—"ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়। কর্ত্তা আপনার মেয়েকে দেখে মত বদলেছেন।"

হরিচরণ নন্দলালের কথার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা উচু হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, 'বল কিহে! তিনি বিয়েতে অমত ক'রেছেন?"

নন্দলাল তাহার ঘাড়টা বাঁকাইয়া, তাহার খোঁচা খোঁচা গোঁপটা বার দুই নাড়িয়া বলিল, "আহা আপনি অত ব্যস্ত হ'চ্চেন কেন! এতে আপনার লাভ ভিন্ন লোকসান নেই। একটু শান্ত হ'য়ে সব কথা শুনিলেই বুঝবেন।"

হরিচরণ তাড়াতাড়ি বলিলেন,--হাঁ—হাঁ, বল বল, শুনি।"

নন্দলাল বলিতে লাগিল, "কর্ত্তা আপনার মেয়েটিকে দেখে একেবারে ভর হয়ে গেছেন। তাই তিনি আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন, যে আশীর্ব্বাদ যেমন হবার কথা আছে

যেমনিই হবে, বিয়েরও যে দিন স্থির হয়েছে সেই দিনই রইলো—কেবল তাঁর পুত্রের পরিবর্ত্তে তিনি নিজেই আপনার মেয়েটিকে বিয়ে করবেন। আপনার মেয়ে দুর্লভ মিত্তিরের গৃহিণী হবেন একি কম সৌভাগ্যের কথা!"

নন্দলালের কথার সঙ্গে সঙ্গে হরিচরণ উঠিতে উঠিতে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "বল কি হে?"

নন্দলাল একগাল হাসিয়া বলিল,—"যথার্থ কথা, সত্যিই আপনার মত ভাগ্য খুব কম লোকের হয়। দুর্লভবাবুর ছায়ায় থেকে কত বেটা বড়লোক হ'য়ে গেল – আর এ একেবারে শ্বশুর। হরিচরণবাবু দু'দিনে শরীর ফিরে যাবে।"

হরিচরণের কণ্ঠতালু একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল,—তিনি আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। ওঝার মন্ত্রের মত নন্দলালের কথার তীব্রতেজে সহসা যেন তাঁহার মুখখানা একেবারে বদলাইয়া গেল,—তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল,—হাতের হুকা খসিয়া পড়িল,—কলিকা ভাঙ্গিয়া একটা অগ্নিকাণ্ড হইবার মত হইল। তিনি বিস্ফারিত নয়নে নন্দলালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈশাখ মাসের খর মধ্যাহ্ন,—প্রচণ্ড তাপে চারিদিক দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। রাস্তার লোক সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। কেবল মাঝে মাঝে ঘর্ম্মাক্ত ফিরিওয়ালা 'ঠাণ্ডি বরফ' হাঁকিয়া পিপাসাতুরের পিপাসা বৃদ্ধি করিয়া দোরে দোরে ফিরিতেছে। রোজগারিগণ বহুক্ষণ হইল নিজ নিজ কর্ম্মে বাহির হইয়া গিয়াছেন। কর্ম্মহীন বেকারগণের দিবা নিদ্রার পূর্ণ সুখ বেশ জমিয়া আসিয়াছে। সেই সময় শোভা ধীরে ধীরে আসিয়া প্রফুল্লনাথের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। এই গৃহখানিতে প্রত্যহ সে একবার করিয়া আসিত, এই গৃহের প্রত্যেক সামগ্রীর সহিত কি যেন একটা কিসের মাদকতা তাহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু সে যে কিসের আকর্ষণ শোভা তাহা জানিত না,—কখন জানিবার চেষ্টাও করে নাই। তবে এই গৃহখানিতে একবার না প্রবেশ করিলে তাহার প্রাণে শান্তি আসিত না—তৃপ্তি হইত না। আজ চারিদিন সে এই গৃহে প্রবেশ করে নাই,—চারিদিন সে মোটেই বাটী হইতে বাহির হয় নাই।

আনন্দের হিমালয় শিখর হইতে দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে পতিত হইয়া তাহার জীর্ণ শীর্ণ দরিদ্র পিতা হৃদয়ে যে, দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছেন, সে বেদনা আর এরূপ ভাবে অধিক দূর অগ্রসর হইলে, বৃদ্ধের যে হৃদয় চিরদিনের মত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে তাহা সে যতটা বুঝিয়াছিল এতটা বোধ হয় পৃথিবীর আর কেহই বুঝিতে পারে নাই। তাই সে পিতার বেদনার ভার একটু লঘু করিবার জন্য, সেই বেদনার কতকটা অংশ নিজে তুলিয়া লইয়াছিল। তাহারই জন্য আজ তাহার পিতার এই যন্ত্রণা, তাহারই জন্য তাহার সদানন্দ পিতার নয়নে অশ্রু প্রবাহ ছুটিতেছে। আজ চারিদিন সে কেবল সেই চিন্তাই করিয়াছে। নীহারের বার বার আহ্বান সত্ত্বেও এ বাটীতে একবারও প্রবেশ করে নাই,—কিন্তু আজ আর সে কিছুতেই একলাটি বসিয়া বসিয়া এই নিদারুণ চিন্তার বোঝা বহন করিতে পারিল না,—চোরের ন্যায় ধীরে ধীরে আসিয়া প্রফুল্লনাথের বাটীতে প্রবেশ করিল।

উপরে উঠিয়া সে প্রথম একবার নীহারের ঘরের দরজা ঠেলিয়া বাহির হইতে উকি দিল,—নীহার ঘুমাইতেছে। নীহারকে ডাকিতে আজ কেমন যেন তাহার সাহস হইল না। সে কোন দিকে না চাহিয়া একেবারে বরাবর প্রফুল্লনাথের গৃহের ভিতরে আসিয়া প্রবেশ করিল। শূন্য গৃহ,—জন-প্রাণী নাই। বিশেষ কাজে সে দিন প্রফুল্লনাথকে একবার বাহির হইতে হইয়াছিল।

শোভা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া নীরবে একখানা শোফার উপর যাইয়া শুইয়া পড়িল। তাহাকে একলা পাইয়া আবার শত সহস্র চিন্তা বিকট দানবের মত চারিদিক হইতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সে অধিকক্ষণ শুইয়া থাকিতেও পারিল না,—আবার উঠিয়া বসিল। টেবিলের উপর হইতে একখানি ছবির বই লইয়া তাহার ছবিগুলি দেখিতে আরম্ভ করিল। পুস্তকের ছবিগুলিতে একটু মনোসন্নিবেশ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না;—সে আবার উঠিল। টেবিলের উপরিস্থিত এটা সেটা নানা দ্রব্য উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে নাড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহাই বা আর কতক্ষণ ভালো লাগিতে পারে। সে মনে মনে বিরক্ত হইয়া প্রাচীরস্থিত পাখার সুইস্‌টী টিপিয়া দিয়া আবার আসিয়া শোফার উপর শুইয়া পড়িল। পাখা শোঁ শোঁ শব্দে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে হাওয়ায় তাহার হৃদয়ের যাতনা শীতল হইল না বরং তাহা আরোও ঘনীভুত হইয়া উঠিল। তাহার বুকের ভিতর একটা চাপা বেদনা, কীটের মত, যেন গহ্বর খনন করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল,—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এ বেদনা সত্যই অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার নয়ন ফাটিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। শোভা সেই শোফার উপর পড়িয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ইহার ভিতর কোন সময় প্রফুল্লনাথ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলেন, শোভা তাহা জানিতে পারে নাই। সহসা তাঁহার ডাকে সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। প্রফুল্লনাথ শোভার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন; অতি স্নেহ-কোমল স্বরে বলিলেন,—"বিবি তুমি কাঁদছিলে! কি হ'য়েছে, ব্যপার কি?"

শোভা তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সঙ্কোচের প্রথম আক্রমণটা কাটাইয়া লইয়া বলিল,—"কই! না!"

প্রফুল্লনাথ শোভার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। একবার প্রখর দৃষ্টিতে তাহার আপাদ মস্তক উত্তমরূপে লক্ষ্য করিলেন; তাঁহার দৃষ্টি শোভার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যেন দেখিতে পাইল। শোভা সে তীব্র দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না, সে মস্তক অবনত করিল। সে একটুখানি ঘাড় বাঁকাইয়া খোলা জানলার দিকে চাহিল; বাহিরের আলো তাহার মুখখানির উপর আসিয়া পড়িল। মাথায় কাপড় নাই, এলোমেলো চুলগুলি পৃষ্ঠের উপর লুটাইতেছে, শাড়ীখানি তাহার স্ফুটনোন্মুখ শরীরকে আঁটিয়া বেষ্টন করিয়াছে। সৌন্দর্য্যের রাণী সহসা যেন আজ শোভার অঙ্গে নবভাবে বিকাশিত হইয়া প্রফুল্লনাথকে একেবারে চমক লাগাইয়া দিল। প্রফুল্লনাথ একখানা চেয়ার টানিয়া শোভার সম্মুখে বসিলেন; গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তারপর এমন অসময়

আমার ঘরে একলাটি ব'সে এমন ভাবে কান্না হ'চ্ছিলো কেন ব'লো তো? দুর্লভবাবুকে কি পছন্দ হয়নি?"

শোভা মুখখানি একটু ভার করিয়া বলিল,—"যাও, সব সময় ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন,—"ঠাট্টা! এর একটি বর্ণও ঠাট্টা নয়। তোমার বাবার সঙ্গে আজ সকালে আমার দেখা হ'য়েছিলো। তিনি বল্লেন প্রফুল্লনাথ সবইতো শু'নেছ, দুর্লভবাবুর সঙ্গে শোভার বিয়ে দেওয়া ভিন্ন আর তো আমি অন্য কোন উপায়ই দেখি না। ভাববার জন্যে দুর্লভ-বাবুর কাছে তোমার বাবা সাতদিন সময় নিয়েছিলেন তারও তো চার দিন কেটে গেছে। তিনদিন আর বাকি আছে, তারপরই যা'হক্ একটা উত্তর দিতে হবে—বুঝেছ!"

শোভা বিরক্তভাবে বলিল,—"হাঁ বুঝেছি। তুমি কাপড় ছাড়গে যাও, ঘেমেত ত্রিখণ্ডি হ'য়েছ, জামা খুলবে না?"

প্রফুল্লনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"সে জন্য মহাশয়াকে ভাবতে হবে না। জামা খোলবার আবশ্যক বোধ হলেই জামা খোলা হবে। এখন যা জিজ্ঞাসা কল্লুম তার জবাব দাও। প্রথম কাঁদা হচ্ছিলো কেন, দ্বিতীয় এ বিবাহে তোমার মত আছে কি না?"

শোভা যে কেন কাঁদিতেছিল, তাহার যথার্থ কারণ সে

নিজেই অবগত ছিল না। আর দুর্লভবাবুকে পছন্দ? কে কবে একজন স্থবির পিতৃতুল্য বৃদ্ধকে পতিরূপে পছন্দ করিতে পারে? কাজেই সে প্রফুল্লনাথের প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? সে নীরবে অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল। সুন্দর মুখ সুপ্ত সৌন্দর্য্যকে সোনার কাটির মত জাগাইয়া তুলিল। কেন্দ্র যেমন তাহার পরিধিকে নিয়মিত করে তেমনি এই মেয়েটীর সমস্ত দেহ আকর্ষণ করিয়া আকাশ, বাতাস, আলোক গৃহের চারিদিকে নৃত্য করিতে লাগিল। প্রফুল্লনাথ আর একবার শোভার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"হুঁ! কতকটা উত্তর পাওয়া গেল। নীরবে অবনত মস্তক—এর মানে হ'চ্ছে তুমি দুর্লভবাবুকে বিয়ে করতে নারাজ এবং সেই জন্যই এই কান্না। তা যেন হ'লো এখন কি কর্ব্বে স্থির ক'ল্লে?"

দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিবার পর শোভা মস্তক তুলিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল,—"কি ক'র্ব্বো ব'লে দাও।"

প্রফুল্লনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"চিন্তার কথা!"

তাহার পর চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। শোভা নীরবে অবনত মস্তকে তাহার অঞ্চলের কালো পাড়টুকু কুঞ্চিত করিতে লাগিল। সহসা প্রফুল্লনাথ আবার উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—"কিন্তু

বিয়েতে তোমার অমত হবার কারণ আমি বিশেষ কিছু দেখিতে পাচ্ছিনে! দুর্লভবাবুর বয়স একটু বেশী হ'য়েছে, তাতে এমন বিশেষ কিছু যায় আসে না। ও বয়সে তোমার চেয়ে ছোট মেয়েকেও আমি ঢের লোককে বিয়ে কর্ত্তে দেখেছি। আর হিন্দু শাস্ত্র যখন এ বিয়েও বিয়ে বলে মঞ্জুর ক'রেছেন, তখন তোমার আপত্তি টিকৃতেই পারে না, এক-বারেই অগ্রাহ্য—একদম বাতিল।"

শোভা কোন উত্তর দিল না, সে নীরবে সেইভাবেই বসিয়া রহিল। প্রফুল্লনাথ বলিতে লাগিলেন,—"দ্বিতীয়তো ঐ বিয়েতে যদি তুমি অমত কর, কাজেই বাধ্য হয়ে তোমার বাবাকেও অমত কর্ত্তে হবে—তাতে ফল দাঁড়াবে তোমার বাবার সঙ্গে দুর্লভবাবুর বিবাদ; তোমার বিয়ের জন্য ব্যতি-ব্যস্ত ইত্যাদি প্রভৃতি একটা বিদিকিচ্ছিরী ব্যাপার। অতএব আমার মতে এ বিয়েতে তোমার সম্মত হওয়াই বিশেষ ভাবে উচিত ও কর্ত্তব্য।"

শোভা এতক্ষণ স্থির হইয়া প্রফুল্লনাথের কথাগুলি শুনিতে ছিল, কিন্তু আর পারিল না। বিষাক্ত তীরের মত প্রফুল্লনাথের কথাগুলি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে যাইয়া আঘাৎ করিল। তাহার নয়ন-পল্লব ছলছল করিয়া উঠিল, মুক্তাবিন্দুর ন্যায় অশ্রুবিন্দু তাহার গণ্ড বাহির ঝরিয়া পড়িল। সে অঞ্চল দিয়া মুখ ঢাকিতে

যাইতেছিল কিন্তু প্রফুল্লনাথ বলিলেন,—"ও মুখ ঢাক আর কাঁদো, ছাড়ানছুড়েন নেই। হিন্দু সমাজ বোঝ? ছাই বোঝ। তার দয়ামায়া নেই,—একরত্তি মেয়ের মতামতের তারা ধার ধারে না। তবে আমার দুঃখ এই যে, 'ছ' ছ' বছর কাছে কাছে রেখেও তোমায় মানুষ কর্ত্তে পাল্লুম না। নারীর কর্ত্তব্য কি জান? ছাই জান! আত্ম-বলিদান। পরের দুঃখ দূর করাই নারীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এখন উত্তর দাও—কি ক'র্ত্তে চাও?"

শোভা বহু কষ্টে অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বলিল,—"তুমি যা বল্‌বে তাই কর্ব্বো।"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন,—"আমি এতক্ষণ কি তবে বল্লুম!"

শোভা অতি ক্ষীণস্বরে বলিল,—"তাই কর্ব্বো!"

বিন্দুবাসিনী নীচে নামিতে ছিলেন, প্রফুল্লনাথের স্বর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রফুল্ল কখন ফিরলি! একা বসে বসে কি বিড়্‌বিড়্‌ ব'কৃছিস্?"

জননীর স্বর শুনিয়া প্রফুল্লনাথ চেয়ার ছাড়িয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন; বলিলেন,—"বলতো মা আমি কার সঙ্গে কথা কইছিলুম?"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন,—"তা কি ক'রে জান্‌বো বাছা!"

প্রফুলনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"না মা তোমায় বলিতেই হবে!"

বিন্দুবাসিনী সে কথায় কাণ না দিয়া নামিয়া যাইতেছিলেন, প্রফুল্লনাথ যাইয়া তাঁহার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইলেন। বিন্দুবাসিনী বলিলেন,—"পথ ছাড়্, আমি কি তোর ঘরে ঢুকিছি যে, বোল্‌বো কার সঙ্গে তুই কথা কচ্ছিলি?"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন,—"তবু—আন্দাজ?"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন,—"না বাছা অত আন্দাজ টান্দাজ আমার নেই।"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন,—"না মা তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বলিতেই হবে।"

বিন্দুবাসিনী পুত্রের কথায় না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার এই পুত্রটির মাঝে মাঝে এইরূপ এক একটী অদ্ভুত আব্দারে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেন; বলিলেন,—"ভালো ফ্যাসাদ! তুই তোর বৌয়ের সঙ্গে কথা কচ্ছিলি।"

প্রফুল্লনাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কেমন করে জান্‌লে মা? তুমি নিশ্চয়ই গুণতে পারেন।"

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তখন কলিকাতা সহরের বহু বিস্তৃত আলিসা ও আলিসা-শূন্য ছাদগুলির উপর গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্র ম্লান হইয়া আসিতেছিল। মধ্যাহ্নের দমকা বাতাস অনেকটা সুস্থির হইয়া যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে থাকিয়া থাকিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। হরিচরণ তাঁহার বৈঠকখানা গৃহে চিৎ হইয়া শুইয়া চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন। অজানিত অবস্থায় এক বিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার নয়ন কোণে সঞ্চিত হইতেছিল। প্রভা তাহার পিতার শিয়রে বসিয়া তাহার কোমল অঙ্গুলিগুলি দিয়া পিতার চুলগুলি নাড়িতে ছিল ও মাঝে মাঝে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া, তাঁহার চিন্তার স্রোতে বাধা দিতেছিল। হরিচরণ কেবল হুঁ হাঁ করিয়া শুনিয়া ও না শুনিয়া কন্যার প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন। সহসা হরিচরণ চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভা তোর দিদি কি কচ্ছেরে?"

প্রভা তাহার পিতার চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে উত্তর দিল,—"দিদিতো এই এলো, সেতো এতক্ষণ প্রফুল্লদাদাদের বাড়ী ছিল।"

হরিচরণ আর কোন কথা কহিলেন না,—"আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। প্রভা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা দিদির বিয়ে বুঝি হবে না?"

কন্যার কথায় একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস যেন হরিচরণের বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তিনি আর একবার কষ্টে চক্ষু মেলিলেন; অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—"যা মা একবার তোর দিদিকে ডেকে আনতো।"

প্রভা চলিয়া গেল,—হরিচরণ আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আজ তাঁহার প্রাণে যে তরঙ্গ বহিতেছে তাহা তাঁহার এই ক্ষুদ্র কন্যাটি পর্য্যন্ত বুঝিয়াছে। এ তরঙ্গাঘাতে হয়তো তাঁহাকে একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইতে হইবে। হরিচরণ প্রাণের ভিতর শিহরিয়া উঠিলেন। পিতার আহ্বান শুনিয়া শোভা ধীরে ধীরে আসিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া একবার তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিল। সে মুখের উপর কি স্নেহ! কি করুণা! কি বেদনা! এই কয়দিনের মধ্যে সে মুখের কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সংসারে শোভাকে লইয়া যে ঝড় উঠিয়াছে তাহার সমস্ত বেগ নিজের উপর লইয়া বৃদ্ধ একলা যুঝিতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া বেদনার তীব্র উচ্ছাস দীর্ঘশ্বাসে বাহির হইয়া আসিতেছে। পিতার অনন্ত স্নেহ যেন গৃহের চারিদিকে এক স্বর্গীয়

আলোকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই মধুর স্নেহের সরস পরশে শোভা মুহূর্ত্তে তাহার আপন শোকের পরিবেষ্টন হইতে বাহির হইয়া আসিল। যে পৃথিবী তাহার নিকট ছায়ার মত বিলীন হইয়া আসিতেছিল, তাহা আবার সত্য হইয়া ফুটিয়া উঠিল;—সে কর্ত্তব্যের পথ দেখিতে পাইল। অতি মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা তুমি কি আমায়

হরিচরণ কন্যায় স্বরে চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন,—অতি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আয় মা, আমার কাছে আয়, একটু বোস।"

শোভা অতি জড়সড় ভাবে ধীরে ধীরে আসিয়া পিতার পার্শ্বে বসিল। হরিচরণ কন্যার চুলগুলি মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন,—"মা আজ তোর মায়ের কথা মনে পড়ছে। সে থাকলে হয়তো—"

হরিচরণ আর বলিতে পারিলেন না—রুদ্ধ অশ্রু অতীতের আঘাতে ঝরিয়া পড়িল। শোভা পিতার বেদনা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিল। সে অবনত মস্তকে বলিল, "বাবা! মা কি আমায় তোমার চেয়েও বেশী ভালো বাস্‌তো?"

হরিচরণ নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—"মা,—মায়ের স্নেহ বোঝবার আগেই তুই মাতৃহারা হইছিস্।

তোর মা তোকে কত ভালবাসতো তা তুই জানিস্‌নি। মর্‌বার সময় সে আমার হাতে ধরে বলে গেছে, শোভা মায়ের স্নেহ পেলে না, তার এমন জায়গায় বিয়ে দিও সে যেন শ্বাশুড়ীর স্নেহে বুঝতে পারে মা কি! কিন্তু—”

হরিচরণের কণ্ঠরোধ হইল তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। এক ফোঁটা অশ্রু পিতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ স্বরূপ শোভার স্কন্ধের উপর পড়িল। শোভা ধীরে ধীরে বলিল,—“বাবা বিয়েতে ভগবানের হাত,—তাঁর যখন ইচ্ছে—তখন তুমি কি কর্ব্বে!”

হরিচরণ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—“তুই মা আমার ঘরের লক্ষ্মী। তোকে কেমন করে এমন স্থবির বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ ক’র্ব্বো। সে আঘাত এ অনেক দিনের বুড়োহাড়ে সহ্য হ’লেও তোর ওই সেদিনকার কচি হাড়ে সহ্য হবে কেন?”

শোভা তাহার পিতার মুখের দিকে চাহিয়াছিল ধীরে ধীরে বলিল,—“কেন বাবা উমা তো আনন্দে বুড়ো শিবের গলায় মালা দিছিলো।”

হরিচরণ কোন উত্তর করিলেন না। চারিদিকে কলিকাতার কর্ম্ম-কোলাহল, তাহারই মাঝখানে একটি গলির ভিতর একখানি ক্ষুদ্র বাটীর বৈটকখানায় পিতা ও কন্যার চিরন্তন স্নিগ্ধ সম্বন্ধটিকে সন্ধ্যাকাশের ম্রিয়মান ছায়ায় অশ্রুসিক্ত মাধুরীতে ফুটাইয়া তুলিল।

সেই সময় বিশ্বনাথ সসব্যস্তে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সম্মুখে শোভা ও হরিচরণকে দেখিয়া উচ্চৈস্বরে বলিল,—"এ হ'তেই পারে না—হবে না—হওয়া উচিত নয়——"

তাহার পর তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিয়া শোভার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"কোন ভয় নেই মা,—তোর বিশ্বনাথ খুড়ো বেঁচে থাকতে এ হবে না—হবে না—হবে না———"

বিশ্বনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রভাও গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, সে বলিল,—"কি হবে না কাকাবাবু?"

বিশ্বনাথ গম্ভীরভাবে বলিল,—"দুর্লভ মিত্তিরের সঙ্গে তোর বিয়ের বে। তোর বাপের কপালে বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখ, হবে না—হবে না—হবে না।"

প্রভা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, বিয়ে হবে না কাকাবাবু। দিদিকে বুঝি দুর্লভবাবু পছন্দ করেনি?"

বিশ্বনাথ গর্জ্জিয়া উঠিল, বলিল,—"পছন্দ করেনি। বেটা সাতপুরুষে কখন এমন মেয়ে দেখেছে?"

তাহার পর হরিচরণের দিকে ফিরিয়া বলিল,—"সে যাক্, এখন ব'লতো ভায়া ব্যাপারটা কি ভেঙ্গেচুরে—তারপর বুঝি।"

হরিচরণ বিশ্বনাথের ভাবে ও ভাষায় একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। আজ চারিদিন বিশ্বনাথ তাঁহার বাটীতে

আসে নাই; তিনিও এই গোলযোগে তাহার কোন সংবাদ লইতে পারেন নাই। সে কেমন করিয়া ইহারি মধ্যে এ সব সংবাদ পাইল। হরিচরণ শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন,—"বিশ্বনাথ এ ক'দিন তুমি ছিলে কোথায়?"

বিশ্বনাথ বলিল,—"আর বল কেন ভায়া, শরীরটা এ ক'দিন এমনি অপটু হয়েছিলো যে বাড়ী থেকে পর্য্যন্ত বেরুতে পারিনি। আজ আমি এইমাত্র প্রফুল্লনাথের কাছে খবর পেলুম—খবর পেয়েই ছুটে আস্‌ছি। এমন সোনার প্রতিমা কখন কি ভাগাড়ে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়! আমার তখনই কেমন মনে হ'য়েছিলো। এখন তুমি কি কর্ব্বে স্থির ক'রেছ তাই আগে আমি শুনতে চাই?"

হরিচরণ ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—"স্থির আর কি ক'র্ব্বো আমার মাথা আর মুণ্ড। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ তিনই ভগবানের হাত—তাই ভাবছি—"

বিশ্বনাথ হরিচরণের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "তা হবে না,—হতে পারে না,—আমি হতে দেব না। বিয়ে না হয় অবিবাহিত রেখে দাও আর তাও যদি না পারো আমায় দাও আমি ভিক্ষে করে পারি, যেমন করে পারি —"

বিশ্বনাথ আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তার আর বলা হইল না,—গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল এক তরুণ

যুবক। যুবকের অঙ্গুলীতে দুই তিনটা অঙ্গুরীয়, অঙ্গে সুচিক্কণ গিলেদার পাঞ্জাবী, মাথায় প্রকাণ্ড টেরী, পায়ে ডিসিনের বারনিস্ চটি। যুবকের গৃহে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গৃহ হাসনাহানার মধুর গন্ধে সৌগন্ধময় হইয়া গেল। বিশ্বনাথ যুবকের গৃহ প্রবেশের ভাবভঙ্গী দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। শোভা ছুটিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল। হরিচরণ যুবকের অভ্যর্থনার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যুবক একবার বিশ্বনাথ ও একবার হরিচরণের দিকে চাহিয়া অতি উচ্চস্বরে বলিল,—"দেখুন হরিচরণবাবু, আপনার মেয়ের সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হবার কথা হ'য়েছে তখন কিছুতেহ আপান বাবার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। এ মেয়ে আমিই বিয়ে কর্ব্বো। দেখি কি ক'রে বাবা আপনার মেয়েকে বিয়ে করেন।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

—০০—

প্রজ্বলিত গুল বিনা টানে সটকায় স্থাপিত প্রকাণ্ড কলিকার তামাকু পোড়াইতেছিল। ভৃত্য বহুক্ষণ হইল সটকার উপর কলিকা বসাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা এখনও পর্য্যন্ত হস্তাদরিত অবস্থায়ই পড়িয়া আছে। মূল্যবান তামাকু বৃথা পুড়িয়া যাইতেছে, তাহাতেও আজ দুর্লভ মিত্রের খেয়াল নাই। তীব্র চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত। রাগে ঘৃণায় তাঁহার চক্ষুর তারা দুইটা যেন বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। পুত্রের এতদূর স্পর্দ্ধা! পিতার বিন্দুমাত্র স্নেহ ব্যতীত যে পুত্র একদিনও জীবিত থাকিতে পারে না,—যে পিতার করুণায় সে জগতের প্রথম আলোক দেখিতে পাইয়াছে, সে কোন্ সাহসে, কিসের স্পর্দ্ধায় পিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। পিতা পুত্রের যে অটুট স্নেহবন্ধন তাহা কেমন করিয়া এমন ভাবে শিথিল হইয়া যায়। ঐ আকাশে যদিও চিন্তার রেখা নাই, জ্যোৎস্নার মধ্যে চিন্তার চাঞ্চল্য নাই, রাত্রি যদিও নিস্তব্ধ—শান্ত। বিশ্ব প্রকৃত চির-দিনই ঐ অগণ্য নক্ষত্রমালার চির-কর্ম্মের মধ্যে-চিরবিশ্রামে বিলীন, তথাপি মানুষের শান্তি

নাই, তৃপ্তি নাই। বাধায় বিঘ্নে সমস্ত জনসমাজ তরঙ্গায়িত। একদিকে অনন্তের ঐ নিত্য শান্তি, আর একদিকে সংসারের এই নিত্য সংগ্রাম, এই দুই এককালে এক সঙ্গে কেমন করিয়া সম্ভব হয়; এই দুশ্চিন্তার মধ্যে দুর্লভ মিত্রের সেই প্রশ্নই বার বার মনে উদয় হইতেছিল। তিনি সংসারের এই জ্বালাময় সংঘর্ষে জীবনকে পদে পদে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ দেখিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে কোন্‌টা সত্য,—কোনটা মিথ্যা?—কি করা কর্ত্তব্য,—কি করা কর্ত্তব্য নহে! যে সর্প তাঁহারই অন্নে, তাঁহারই কৃপায় আজও জীবিত রহিয়াছে, সে যদি তাঁহারই বক্ষে দংশন করিবার জন্য তাহার বিষধর ফণা বিস্তার করিতে পারে, তখন কেন তিনি তাহার বিষদন্ত চিরদিনের মত ভঙ্গ করিয়া না দিবেন। আর যাহাতে সে কখনও ফণা না তুলিতে পারে, তাহাই করা কি তাঁহার কর্ত্তব্য নয়?

দুর্লভবাবু যে গৃহে বসিয়া এই জটিল চিন্তার সমস্যায় নিমগ্ন ছিলেন, সেখানি তাঁহার শয়নকক্ষ। গৃহে আসবাব পত্র বিশেষ কিছুই ছিল না, থাকিবার মধ্যে ছিল একখানি খাট, দুই তিনটা আলমারী, একটা প্রস্তরের সুগোল টেবিল ও একটা বিলাতী লোহার সিন্দুক। গৃহের দ্বারের সম্মুখস্থ প্রাচীরে তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর একখানা প্রকাণ্ড তৈল চিত্র। স্ত্রীর জীবদ্দশায় আলমারীতে যে সমস্ত দ্রব্য যে ভাবে

সজ্জিত ছিল, তাহা আজও সেই ভাবেই সজ্জিত রহিয়াছে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহা যে কোন দিনও খোলা হইয়াছে, এমন বলিয়া বোধ হয় না। একবার তিনি গৃহের চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন,—তাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর তৈলচিত্রের উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত মূর্ত্তির ছায়া তিনি পুত্রের মুখের উপর দেখিতে পাইলেন। যে দুর্ল্ভ মিত্র অসহায় বিধবার গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না, নাবালকের বিষয় কৌশলে বাজেয়াপ্ত করিতে যাঁহার হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই, সহসা যেন আজ কিসের ভারে তাহা একেবারে নত হইয়া পড়িল। কে যেন তাঁহার অন্তরাত্মার ভিতর প্রবেশ করিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"সহস্র অপরাধ করিলেও সে তোমারই পুত্র, তোমারই রক্তে তাহার দেহ পুষ্ট। পুত্রের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত যে তোমার নিজের মঙ্গলামঙ্গল এক সূত্রে গ্রথিত। তিনি আর চিন্তা করিতে পারিলেন না। পার্শ্বস্থিত সটকার নলটা উঠাইয়া লইলেন। সেই সময় অতি ক্ষীণ, অথচ অতি মধুর তাঁহার কন্যার স্বর কর্ণে প্রবেশ করিল,—"বাবা!"

তিনি ফিরিলেন,—দ্বারের দিকে চাহিলেন। দ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান তাঁহার কন্যা উমা। নিরাভরণা শুভ্রবসনা কন্যার

প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার বুকের রক্ত যেন লাফাইয়া উঠিল। দুর্লভবাবু অনেক সাধ করিয়া তাঁহার এই একমাত্র বড় আদরের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বহুপাত্র দেখিবার পর সত্যই এক সুপাত্রের হস্তে সমার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কন্যার ভাগ্য মন্দ। বিবাহের দুই বৎসর যাইতে না যাইতে নারী-জীবনের সব হারাইয়া, চিরদিনের মত দুঃখের বোঝা মাথায় লইয়া সে আবার আসিয়া পিতৃগৃহে আশ্রয় লইয়াছে। বজ্র অপেক্ষা কঠোর দুর্লভ মিত্রও এই বিষাদ প্রতীমার সম্মুখে বিগলিত হইয়া পড়িতেন। কন্যাকে দেখিবামাত্র তাঁহার সব আশা, সব উদ্দ্যম যেন একটা ঘোর অন্ধকারে ঢাকিয়া দিত। তাই তিনি পারতপক্ষে কন্যার সম্মুখীন হইতেন না।

আজ সহসা কন্যাকে অসময়ে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কথা কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না। তিনি বিহ্বলের ন্যায় সেই বিষাদ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি বিষাদে সেই মূর্ত্তি সমাচ্ছন্ন। নিরাভরণ, শুভ্রবসন কি পবিত্র বিষাদ স্মৃতি তাহার চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। সে স্মৃতি কি গম্ভীর! কি পবিত্র! কি বেদনাপূর্ণ! মূর্ত্তির গৃহ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গৃহখানা যেন একটা নিবিড় বিষাদ ছায়ায় ভরিয়া গেল।

পিতাকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া কন্যা অতি করুণ স্বরে বলিল,—"বাবা! বিনোদকে কি তুমি তাড়িয়ে দিতে বলেছ?"

দুর্লভ মিত্র নীরব! সত্যই তো তিনি এই মাত্র তাঁহার পুত্রকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য সরকারকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজেকে কঠিন করিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ মা, সত্যই আমি তাকে বাড়ী থেকে বার করে দিতে বলেছি। যে পুত্র পিতার মর্য্যাদা রাখে না, পিতা কেন সে পুত্রের মর্য্যাদা রাখ্‌বে। আবর্জ্জনার স্থান বাড়ীতে নয়, বাহিরে—আঁস্তাকুড়ে।"

উমা একটুখানি নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল,— "তবু বাবা সে তোমারই ছেলে। পুত্রের অপরাধ যদি পিতা মাপ না করেন, তবে তার অপরাধ মাপ কর্‌বে কে? বাবা! বিনোদকে এবারকার মত মাপ কর।"

দুর্লভ মিত্র কোন কথা কহিলেন না, তিনি অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলেন। উমা পিতার উত্তরের প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় বলিল,—"বাবা হরিচরণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিনোদের বিয়ের সম্বন্ধ তুমিই স্থির করেছিলে। তোমার বল্‌বার পূর্ব্বে সে তো কখনও তাকে বিয়ে কর্ত্তে চায়নি। বিনোদকে মাপ কর, তারই সঙ্গে হরিচরণবাবুর মেয়ের বে দাও। এতে তোমার মর্য্যাদা বাড়্‌বে, শত্রুর মুখে

চুণ কালি পড়্বে। আর মারও শেষ সাধ অপূর্ণ থাক্‌বে না।”

কন্যার কথায় পিতার প্রাণ গলিয়া গেল। পিতা ও কন্যা উভয়েই নীরব, বহুক্ষণ আর কাহারও মুখে কোন কথা নাই। কেবল কলিকাতা নগরীর বিরাট কোলাহল, গাড়ীর ঘড়ঘড় অবিরাম গতিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। সহসা দুর্লভ মিত্র চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—“গোবর্দ্ধন!”

পরক্ষণেই হৃষ্টপুষ্ট ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গোবর্দ্ধন গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। গোবর্দ্ধন দুর্লভবাবুর খাস খানসামা। সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র দুর্লভবাবু বলিলেন,—“বড়বাবু!”

গোবর্দ্ধন চলিয়া গেল, দুর্লভবাবু কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“উমা, তোমার কথাই ঠিক? আমি হরিচরণের মেয়ের সঙ্গেই বিনোদের বিয়ে দেব স্থির কর্‌লেম। কাল আমি কাশী যাচ্ছি, একমাস বাদে ফিরে এসেই বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক কর্‌বো।”

কন্যা বিষাদ হাসি হাসিয়া বলিল,—“বাবা! এক মাস বাদে যাকে তুমি পুত্রবধূ কর্‌বে, সে দিনরাত তোমার চিরশত্রু অঘোর বোসের বাড়ীতে থাকে, এতে এরি মধ্যে নানা জনে নানা কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছে।”

অঘোর বোসের নামে দুর্লভবাবুর চক্ষু আবার জ্বলিয়া উঠিল। সে বহুদিনের কথা, এক বিধবার কয়েকখানি অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়া দুর্লভ মিত্র তাহাকে হাঁকাইয়া দেন। বিধবা উপায়হীন হইয়া অঘোরবাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করে। অঘোরবাবু বিধবার মর্ম্মবেদনা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন,—তাই তিনি নিজের অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বিস্তর মামলা মোকর্দ্দমার পর দুর্লভ মিত্রের নিকট হইতে সেই অলঙ্কার কয়খানি আদায় করিয়া বিধবাকে প্রদান করিতে সক্ষম হন। সেই হইতে পাড়ার মিত্র ও বসু পরিবারের মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দুর্লভবাবু কন্যার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"সে কি! সে বাড়ীতে থাকে না?"

উমা বলিল,—"না বাবা। শুন্‌লুম সে অধিকাংশ সময় অঘোর বোসের বাড়ীতে থাকে। প্রফুল্লবাবু নাকি তাকে খুব ভালবাসেন।"

দুর্লভবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় বিনোদবিহারী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া অবনত মস্তকে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্লভবাবু পুত্রের মুখের দিকে অতি তীব্রভাবে চাহিয়া কহিলেন,—"আমি তোমার আস্পর্দ্ধার কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। সে

কথা যাক্, আমি হরিচরণের মেয়ের সঙ্গে তোমারই বিয়ে দেব স্থির করেছি, কাল আমি কাশী যাচ্ছি, আমার ফিরতে এক মাসের বেশী হবে না। আমি দেখতে চাই, তোমার এত তেজ কিসের। এই এক মাসের মধ্যে তোমায় প্রমাণ কর্ত্তে হবে, অন্ততঃ তুমি তোমার নিজের স্ত্রীকেও প্রতিপালন কর্ত্তে সক্ষম।”

বিনোদবিহারী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু দুর্লভবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—“আমি তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাইনি। তোমার যদি কিছু বল্‌বার থাকে, একমাস বাদে এসে ব'লো।”

বিনোদবিহারী যে ভাবে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, আবার ঠিক সেই ভাবেই বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। দুর্লভবাবু চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—“গোবর্দ্ধন।”

গোবর্দ্ধন কলিকায় ফু দিতে দিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল; দুর্লভবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—“সরকার মশাই।”

গোবর্দ্ধন সটকায় কলিকা বসাইয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল; দুর্লভবাবু রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—“যাও মা, এই কথাই পাকা রইলো। একমাস পরে হরিচরণের মেয়ের সঙ্গে বিনোদের বে।”

উমা চলিয়া গেল। দুর্লভবাবু সটকার নলটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে টানিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ সরকার গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল, সে কর্ত্তার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিল। বহুদিন হইল এক স্থবীর বৃদ্ধকে ভিটা ছাড়া করিবার সঙ্কল্প যে দিন প্রথম দুর্লভ মিত্রের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, সেই দিন সে কর্ত্তার চক্ষে এই তীব্র চাউনি দেখিয়াছিল। তাহার পর দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, তবু সে আজও সে চাউনি ভুলিতে পারে নাই। আজ প্রভাত হইতে বাবুর মেজাজ কোন পর্দ্দায় বাঁধা রহিয়াছে, তাহা তাহার নিকট অবিদিত নাই। আজ আবার কাহার সর্ব্বনাশের আয়োজন হইতেছে, তাহাই ভাবিয়া তাহার কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া উঠিল, সে অতি সঙ্কুচিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু কি আমায় ডেকেছেন?"

দুর্লভ মিত্র ফিরিলেন,—সটকার নলটা পার্শ্বে রাখিয়া বলিলেন,—"হা! আমি কালই কাশী যাব, সেখানে আমার একমাস দেরী হ'তে পারে, তার যা যা বন্দোবস্ত দরকার তা যেন ঠিক হয়।"

দুই হস্ত কচলাইতে কচলাইতে সরকার মহাশয় কহিল,—"সেখানে কি কোন জরুরী কাজ আছে?"

দুর্লভবাবু অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"হুঁ।"

তারপর আবার একটু নীরব থাকিয়া কহিলেন,—"হরিচরণ-বাবুকে খবর দাও, আমি এখনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাই।"

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুই বন্ধুতে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, সহসা দুর্লভমিত্রের জরুরী তলব পাইয়া, "বিশ্বনাথ বোস,—আমি আস্‌ছি," বলিয়া হরিচরণ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। তাহার পর বিশ্বনাথ একাকী প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত করিয়াছে,—পাঁচ কলিকা তামাকু নিঃশেষ হইয়াছে, তথাপি হরিচরণের দেখা নাই। দুর্লভ মিত্রের উপর বহুকাল হইতেই বিশ্বনাথের কেমন একটা বীতশ্রদ্ধা ছিল। সে তাহার কোন কার্য্যই কোন দিন ভাল বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই। আজ সহসা এত রাত্রে এরূপভাবে দুর্লভ মিত্র কেন হরিচরণকে ডাকাইয়া পাঠাইল, সে একাকী বসিয়া মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতেছিল, আর যত প্রকার কু-ভাবনা থাকিতে পারে, তাহার সমস্ত গুলাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনের মধ্যে কেবলই উঁকি ঝুঁকি দিতে ছিল। গৃহে কেহ নাই,—কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবারও উপায় নাই। হুকার জল যেমন সেবনকারীর প্রতিটানে খোলের ভিতর গুলাইতে থাকে, এই দুর্ভাবনাগুলাও তাহার পেটের ভিতর ভয়াবহ ভাবে গুলাইতে আরম্ভ করিল। পার্শ্বের বাটীর ঘড়ীতে টং

টং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। তাহার আর এরূপ ভাবে একাকি বসিয়া থাকা অসম্ভব হইল, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে একটুখানি কি চিন্তা করিল, তাহার পর একেবারে অন্তঃপুরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া, "প্রভা প্রভা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

বিশ্বনাথের ডাকে প্রভা ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল, সে বাহিরে উপস্থিত হইবামাত্র, বিশ্বনাথ বলিল,—"শিগ্‌গীর তোর দিদিকে ডাক ;—তোর বাবাকে ব্যাটা নিশ্চয়ই গুমি করেছে।"

প্রভা বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"সে কি কাকাবাবু! বাবাকে কে কি করেছে?"

বিশ্বনাথ বলিল,—"সে অনেক কথা,—তুই বেটী বুঝ্‌বিনি। শিগ্‌গীর তোর দিদিকে ডাক,—আমায় এখনি থানায় যেতে হবে।"

বিশ্বনাথের গম্ভীর ভাব ও থানার নামে প্রভা সত্যই ভীত হইল, সে অতি মৃদুস্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"থানায় খবর দেবে কেন কাকাবাবু?"

বিশ্বনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিল,—"বেটী ফের কথা কয়, যা শিগ্‌গীর তোর দিদিকে ডাক।"

প্রভা গম্ভীরভাবে বলিল,—"দিদি কি ক'রে আসবে,—বামুন ঠাকুরুণ আসেনি, সে যে আজ রাঁধ্‌ছে।"

বিশ্বনাথ মহা গরম হইয়া বলিল,—"তোর দিদি রাঁধছে! না এ মেয়ে দুটোকে না মেরে আর হরিচরণ ছাড়্‌ছে না।"

প্রভা বিশ্বনাথের কথায় এক গাল হাসিয়া বলিল,—"বা! দিদি না রাঁধলে রাঁধ্‌বে কে? আমরা খাব কি?"

বিশ্বনাথ উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—"রাঁধ্‌বে তোর বাবা।"

প্রভা মুখখানি একটু ভারি করিয়া বলিল,—"হুঁ! বাবা বুঝি রাঁধ্‌তে জানে?"

বিশ্বনাথ দৃঢ়স্বরে বলিব,—"কেন বাজারে কি দোকান সব উঠে গেছে?"

প্রভা আবার হাসিয়া বলিল,—"বাজারে বুঝি ভাত পাওয়া যায়?"

একেই হরিচরণের বিলম্বে বিশ্বনাথের প্রাণটা একেবারে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর প্রভার কথায় সে মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে আর কোন কথা না বলিয়া একেবারে রন্ধনগৃহে যাইয়া উপস্থিত হইল। রন্ধনগৃহে শোভা কোমরে অঞ্চল জড়াইয়া মহা উৎসাহ সহকারে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। প্রজ্বলিত উনানের প্রখর উত্তাপে তাহাব মুখের সমস্ত রক্ত জমাট বাঁধিয়া মুখখানিতে যেন সিন্দুর মাখাইয়া দিয়া ছিল,—তাহার উপর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম মুক্তার মত ভাসিয়া উঠিয়া তাহাতে শতশ্রী উদ্ভাসিত করিতেছিল।

বিশ্বনাথ রন্ধনগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উনানের সম্মুখে হাতা হস্তে এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে থমকাইয়া দাঁড়াইল। অন্নপূর্ণার স্বরূপ মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সে নীরবে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

বিশ্বনাথের পদশব্দে শোভা দ্বারের দিকে চাহিয়াছিল, সে মৃদু হাসিয়া বলিল,—"কাকাবাবু বুঝি প্রভার কাছে শুনে আমার রান্না দেখ্‌তে এলে? তা শুধু দেখ্‌লে চল্‌বে না, আজ তোমায় এখানে খেয়ে যেতে হবে।"

শোভার কথায় বিশ্বনাথের চমক ভাঙ্গিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল,—"সে যা হয় পরে হবে, এখন আমি থানায় চল্লুম। তোর বাপকে নিশ্চয়ই দুর্লভ মিত্তির গুমি করেছে।"

থানার নামে শোভার প্রফুল্ল মুখখানি একেবারে ম্লান হইয়া গেল। সে তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটা আরও বড় করিয়া অতি ভীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"গুমি! সে কি কাকাবাবু।"

বিশ্বনাথ গম্ভীর ভাবে বলিল,—"গুমি কি জানিস্‌নি? আস্ত মানুষকে মানুষই গাপ। নিশ্চয়ই কোন একটা ছোট গুপ্ত ঘরে হরিচরণকে আটকে রেখেছে। দুর্লভ মিত্তির সব পারে। সে এই আস্‌ছি বলে গেল, নইলে এত দেরী হয়। না আর দেরী করা কিছুতেই উচিত নয়; শেষ

তাকে বের করা বিপদ হবে। কোন ভয় নেই মা, আমি এখনই পুলিস নিয়ে হাজির হচ্ছি।"

বিশ্বনাথের এই অদ্ভুত কথায় শোভা না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সে হাসিতে হাসিতে বলিল,—"কাকাবাবুর যেমন কথা! শুধু শুধু বাবাকে আট্‌কে রাখ্‌বে কেন? তুমি একটু বস, বাবা এখনি এলো বলে।"

শোভার হাসিতে বিশ্বনাথ বেজায় বিরক্ত হইয়া বলিল,— "মেয়েগুলোর বুদ্ধিশুদ্ধি কোন দিনই হয় না। না আর দেরী করা কিছু নয়—"

শোভা হাসিয়া বলিল,—"ওইতো বাবা এসেছে, বাহিরের ঘরে প্রভার সঙ্গে কথা কইছে।"

"তাইতো, তা হ'লে ব্যাপারটা কি হ'লো। নিশ্চয়ই কোন ক্রমে পালিয়ে এসেছে," বিশ্বনাথ তাড়াতাড়ি আবার বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেল।

হরিচরণ বাহিরের ঘরে প্রভার সহিত কথা কহিতেছিল,— বিশ্বনাথকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন,—"বিশ্বনাথ তামাক খাও—তামাক খাও। সংবাদ মহাশুভ। টাকায় মানুষের প্রাণ যথার্থই উদার করে দেয়। দুর্লভবাবু সত্যই একটা মহৎ লোক। তুমি তামাক খাও—তামাক খাও—"

হরিচরণের অকস্মাৎ [illegible] দেখিয়া বিশ্বনাথ একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে ব্যাপারটা কি ভাল কারণ জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ সহকারে হরিচরণের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। হরিচরণ বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"ওঃ কি দুর্ভাবনায়ই এ কটা দিন কাটান গেছে। কেমন করে বুঝব বল না ভাই, এর ভেতর এতখানি মারপ্যাচ রয়েছে। আমরা কি ভুলই করেছিলেম। নাও তুমি এখন তামাক ধরাও।"

প্রভা হাসিয়া বলিল,—"বাবা, কাকাবাবু থানায় যাচ্ছিল। কি সব বলছিলো, দুর্লভবাবু তোমায় গুমি করেছে না কি করেছে।"

হরিচরণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; কহিলেন,—"তোর কাকাবাবু একটা আস্ত পাগল।"

বিশ্বনাথ এইবার কথা কহিল, বলিল,—"পাগলতো বটেই! বলি তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়? এই আস্‌ছি বলে যে গেলে, তারপর আর কোন খবর নেই। দুর্লভ মিত্তির তো আর লোকটা সোজা নয়, কাজেই আমায় থানায় যেতে হচ্ছিলো।"

হরিচরণ সেই ভাবেই হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বিশ্বনাথ তুমি আস্ত পাগল! তুমি যে সব কথা তলিয়ে বোঝ'না ওইটাই তোমার মহৎ দোষ, দুর্লভবাবু যথার্থই একটা মহৎ লোক হে।

যাবামাত্র সে খাতির দেখে কে। তারপর এ কথা সে কথার পর আসল কথা পাড়লেন, বল্লেন হরিচরণ আমি আর বুড়ো বয়সে যে বিয়ে কর্‌বো না, এ টুকু তোমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন নিশ্চয়ই তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দেবই।"

বিশ্বনাথ একটু যেন বিস্মিত হইয়া বলিল,—"তা হ'লে বল বিয়ে স্থির ?"

হরিচরণ তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"তাতে আর সন্দেহ আছে। তবে দিনটা একটু পিছিয়ে গেল। কাল দুর্লভবাবুকে একটা কি জরুরী কাজে কাশী যেতে হচ্ছে, সেখানে খুব বেশী তাঁর একমাস বিলম্ব হতে পারে। তিনি ফির্‌লেই বিয়ের একটা ভাল দিন স্থির হবে। বিয়েটা আস্‌ছে মাসের শেষাশেষী হওয়াই সম্ভব।"

বিশ্বনাথ মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া বলিল,—"কিন্তু এ বিয়েতে আমার একেবারেই মত নেই। আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে।"

হরিচরণ নিজেকে একটু গম্ভীর করিয়া বলিলেন,—"বিশ্বনাথ, ঐটাই তোমার প্রধান রোগ। সব কথাই ঐ কেমন মনে হচ্ছে এ তো লেগেই আছে।"

সেই সময় শোভা তাহার রন্ধনকার্য্য শেষ করিয়া সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিচরণ কন্যার দিকে ফিরিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁ মা রান্না হয়ে গেল?"

শোভা সলজ্জহাস্যে পিতার নিকট আসিয়া বসিয়া ঘাড় নাড়িল। হরিচরণ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"দেখ্ মা, কাল থেকে তুমি আর ও বাড়ীতে বুঝলে কিনা প্রফুল্লনাথদের বাড়ীতে যখন তখন যেওনা। দুদিন বাদে তুমি দুর্লভবাবুর পুত্রবধূ হবে। এখন আর তোমার যার তার বাড়ী যাওয়া ভাল দেখায় না। প্রফুল্লনাথদের সঙ্গে দুর্লভবাবুর জানইতো মা বরাবরই মনোমালিন্য।"

বিশ্বনাথ কলিকা ধরাইতেছিল, কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সে কহিল,—"তার সঙ্গে এর কি! যাদের বাড়ীতে সে মানুষ হ'লো বল্‌লেই হয়, সেখানে আর সে যাবে না! এ সব যে তোমার অনাসৃষ্টি কথা।"

হরিচরণ বেশ একটু কিন্তু ভাবে বলিলেন,—"আরে ভাই যখন তাদের আপত্তি, তখন নাই বা গেল।"

বিশ্বনাথ গর্জ্জিয়া উঠিল; বলিল,—"আপত্তি! এ আপত্তি হতেই পারে না। এ সব গোলমেলে কথা আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না।"

হরিচরণ মনে মনে বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—"বিশ্বনাথ, তোমার বুদ্ধি জিনিষটা কোন দিনই হ'লো না। তাদের আপত্তি আর ও বলবে কিনা আপত্তি হতেই পারে না।"

বিশ্বনাথ চীৎকার করিয়া বলিল,—"আমি তোমার ও কোন কথাই শুনতে চাইনি। আমি একবার মাকে জিজ্ঞাসা করবো। তার এ বিয়েতে মত আছে কিনা, তারপর আমার বুদ্ধিতে যা হবে আমি তাই করবো দেখি তুমি কি কর্ত্তে পার!"

প্রভা হাসিতে হাসিতে বলিল,—কাকাবাবু দিদির খুব মত আছে।"

বিশ্বনাথের মেজাজ গরম হইয়া উঠিয়াছিল; সে বিকৃত স্বরে কহিল,—"তুই থাম বেটী,।"

তারপর শোভার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"বলতো মা, আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই, এ বিয়েতে তোমার মত আছে কি না?"

শোভাকে অবিচলিত ভাবে হেটমুণ্ডে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িতে দেখিয়া বিশ্বনাথ একেবারে হতবম্ব হইয়া গেল। তাহার হস্ত হইতে কলিকা খসিয়া পড়িল, দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিল। তাহার মুখের চেহারাটা সহসা যেন মায়া মন্ত্রে একেবারে বদলাইয়া গেল। সে শোভার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত

ভাবে চাহিয়া রহিল। কেবল মাত্র তাহার মুখ হইতে একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল, "সে কি মা ?"

কেহ কোন উত্তর দিল না; সমস্ত ঘরখানা যেন একটা বিভীষিকাময়ী নীরবতার ভিতর ঘাড় গুজিয়া বিশ্বনাথের কথার উত্তরে একটা বিকট বিদ্রূপ করিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রভাতে হরিচরণ বাহিরের ঘরে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন, আর পরিচিত যাহাকে দেখিতেছিলেন, তাহাকেই রাত্রের আনন্দ সংবাদটা দিতে ছাড়িতে ছিলেন না। দুর্ভাবনায় এ কয়দিন তিনি অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন বলিলেই হয়। আজ একটু নিশ্চিন্ত হইয়া মহা আরামে এক এক চুমুক গরম চা পান করিতেছিলেন,—আর মনে মনে কন্যার বিবাহে কি করিবেন, কি না করিবেন তাহারই একটা ফর্দ্দ আওড়াইতে ছিলেন। ঘরটী রাস্তার উপরেই, নানা জনে নানা কাজে চলিয়াছে। হরিচরণের দৃষ্টি সে দিকে বড় একটা আকৃষ্ট হয় নাই, তিনি নিজের আনন্দ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা বাহিরে দৃষ্টি পড়ায় হরিচরণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলেন,—"প্রফুল্ল নাকি! আরে শোন—শোন।"

প্রফুল্লনাথ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। হরিচরণ বলিলেন, "বোস, এমন সকালে কোথায় যাচ্ছ?"

প্রফুল্লনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"একবার উকিলের বাড়ী যেতে হবে।"

হরিচরণ সে কথার কোন জবাব না দিয়া একগাল হাসিয়া বলিলেন, "তারপর দুর্লভ মিত্তিরের কাণ্ডটা শুনেছ বোধ হয়?"

প্রফুল্লনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কাণ্ড আবার কি! বিবিকে বিয়ে কর্ত্তে চেয়েছেন।"

হরিচরণ বলিলেন,—"আরে না না কাল রাত্রে এক অদ্ভুত কাণ্ড হয়ে গেছে।"

প্রফুল্লনাথ হরিচরণের কথার বিশেষ কোন ভাব বুঝিতে পারিলেন না, তিনি নীরবে হরিচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হরিচরণ মহা উৎফুল্ল ভাবে বলিতে লাগিলেন,—"কাল রাত্রে দুর্লভবাবু আমায় ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে বিনোদবিহারীর সঙ্গেই শোভার বিয়ে পাকা হ'য়ে গেল। এ কটা দিন কি দুর্ভাবনায় কাটিয়েছি তা তোমায় কি বল্‌বো প্রফুল্লনাথ। আমি গরীব, এই বাড়ী-টুকু তাও দেখনা দুর্লভবাবুর কাছে বাঁধা পড়েছে। তা পড়ুক সে জন্য দুঃখ নেই, কিন্তু আমার মা-মরা সোণার পুতুল, তাকে কেমন করে একটী সুপাত্রের হাতে দেব সেই ভাবনাই আমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিলেম। তোমার যত্নে মা আমার কহিনুরের চেয়েও অমূল্য হয়েছে,

পয়সার অভাবে হয়তো এমন রত্নটীকে যার তার হাতে তুলে দিতে হ'তো। কিন্তু বাবা ভগবান মুখ রেখেছেন—"

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না; অজ্ঞাতসারে দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। বড় বড় জলের ফোঁটা তাঁহার দুই কপোল বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। প্রফুল্লনাথ এই বৃদ্ধের শীর্ণ কৃশ মুখের উপর স্নেহের যে স্নিগ্ধ মধুর ছায়াপাত অবলোকন করিলেন, তাহাতে তাঁহার ভক্তিতে মস্তক আপনিই নত হইয়া পড়িল। সেই সময় শোভা আসিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল,—সে মুখ তুলিয়া একবার প্রফুল্লনাথের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই অতি সঙ্কুচিত ভাবে মস্তক অবনত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা বেলা হ'লো, বাজারে যাবে না?"

কন্যার কথায় হরিচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "যাই মা।"

তারপর প্রফুল্লনাথের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"বোস বাবা, আমি বাজারটা ততক্ষণ করে আসি।"

হরিচরণ একখানি গামছা লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। প্রফুল্লনাথও উঠিতেছিলেন,—কিন্তু শোভা তাঁহার নিকটে আসিয়া হেটমুণ্ডে অতি ক্ষীণস্বরে বলিল,—"তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে।"

শোভার সুরের গাঢ়তা দেখিয়া প্রফুল্লনাথ একটু বিচলিত হইলেন, কিন্তু মনের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া অতি সরল ভাবেই বলিলেন, "তাই নাকি! তা তোমার আর তো কিছু বল্‌বার নেই। দুর্ল্লভবাবুর বয়স একটু বেশী ছিল সেটা একটা বল্‌বার কথা বটে, কিন্তু তাঁর ছেলের বিষয়ে কোন কথাই বলা চলে না।"

শোভা মুখখানি আরও ম্লান করিয়া সেই ভাবেই বলিল, "আমার সব কথায়ই তুমি ঠাট্টা কর, সে যাক্ আর কোন দিন আমি তোমায় কোন কথা বলবো না। না জেনে হয়তো তোমার পায়ে অনেক দোষ অপরাধ করেছি, সে সব তুমি ভুলে যেও। আর বোধ হয় তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।"

সুতীক্ষ্ণ বর্ষার খোঁচার মত কথাটা প্রফুল্লনাথের হৃৎপিণ্ডে আঘাত করিয়া তাঁহাকে একবারে গম্ভীর করিয়া দিল। অল্পবুদ্ধি নারী সামান্য একটু আঘাতেই আত্মহত্যা করিয়া বসে এ ধারণাটা বহুকাল হইতেই তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। সেই ধারণাটাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিল। তিনি বিশেষ বিচলিত হইয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "কেন! অপরাধ?"

প্রফুল্লনাথের প্রাণের মধ্যে বার বার উদয় হইতে লাগিল—

এত কম বয়সে মেয়েরা কেমন করিয়া এমন সাবালক হইয়া বসে। শোভা একটুখানি নীরব থাকিয়া, অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল,—"তা জানি না। দুর্লভবাবুর আপত্তি, বিশেষ তোমার—"

প্রফুল্লনাথ যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। শোভার কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া বলিলেন, "এই কথা! আমি ভেবে-ছিলাম বুঝি অন্য কিছু। এ আর এমন কি বিশেষ কথা,—একথা তিনি একশো বার বল্‌তে পারেন। আর তাঁর যাতে আপত্তি, তা তোমারও করা কোন ক্রমেই উচিত নয়।"

শোভা রাত্রে অনেক ভাবিয়া স্থির করিয়াছিল, প্রফুল্ল-নাথের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই সে এই কথাটা বলিয়া বেশ একটু জমাইয়া তুলিবে। তাই আরম্ভটা সে বেশ ভাল ভাবেই সুরু করিয়াছিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কথাটায় প্রফুল্লনাথ নিশ্চয়ই একটু বিচলিত হইয়া পড়িবেন। কিন্তু প্রফুল্লনাথের কথায় তাহার সমস্ত ধারণাটাই একেবারে এলোমেলো হইয়া গেল। আজ ছয় বৎসর ঘনিষ্ঠ মিলনেও কেন যে, সে এই লোকটার অন্ত পাইল না, তাই ভাবিয়া তাহার দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু নয়নের উপর ভাসিয়া উঠিল। সে নীরবে হেট মুণ্ডে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রফুল্লনাথ শোভার মনের ভাব বুঝিলেন। তিনি মনে মনে

হাসিলেন। অভিমান জড়িত অশ্রুসিক্ত শোভার স্তব্ধ মূর্ত্তিটি প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকে তাঁহার বড়ই মধুর ঠেকিল। তাহা যেন ধীরে ধীরে তাঁহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ের মাঝখানে একটা চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া দিল। শোভাকে নীরব দেখিয়া প্রফুল্লনাথ বেশ একটু গম্ভীর হইয়া আবার বলিলেন, "শ্বশুরের মর্য্যাদা রাখ্‌তে এই সামান্য ত্যাগটুকু স্বীকার কর্‌তে তুমি দুঃখিত! স্বামীর মর্য্যাদা রাখতে যে, বড় আদরের রাজকন্যা জনকদুহিতা সীতাদেবী বনবাসের দারুণ ক্লেশও আশীর্ব্বাদের মত মাথা পেতে নিয়েছিলেন! বিবি মনে থাকে যেন, তুমিও সেই নারী। যেদিন শুনবো তুমি তোমার কুলবধূর ন্যায্য আসন গ্রহণ কর্ত্তে পেরেছ, সে দিন আমি যত সুখী হব, তত সুখী বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেউ্‌ হবে না। আমারই শিক্ষায় তুমি তোমার ন্যায্য আসন লাভ কর্ত্তে পেরেছ, এ কথা যখন আমার মনে হবে, তখন গর্ব্বের প্রকাণ্ড সান্ত্বনা আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দেবে।"

শোভা তথাপি কথা কহিল না,—প্রফুল্লনাথের কথাগুলা তাহার কর্ণের ভিতর দিয়া মরমে যাইয়া সমস্ত দেহের শিরায় শিরায় প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, প্রফুল্লনাথ কত বড়—আর সে কত ছোট। সাগর অনন্ত উচ্ছ্বাস

লইয়া নীরবে অনন্তের সহিত মিশিতে ছুটিয়াছে, আর ক্ষুদ্র তটিনী একটু মাত্র সামান্য উচ্ছ্বাসে একেবারে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রফুল্লনাথ একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন,—"তুমি আর আমার বাড়ী যাবে না,—তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না, ভেবনা বিবি, এ আমার কম দুঃখ! কিন্তু এমন কি দুঃখ আছে যা কর্ত্তব্যের কাছে মাথা হেট না করে?"

জল ভরা মেঘ ভাসিয়া যাইতেছিল, যেমনি আর একটী বেদনা ভরা বাতাস স্পর্শ করিল অমনি সমস্ত জলের বোঝা ঝরিয়া পড়িল। প্রফুল্লনাথের একটি মাত্র বেদনার কথা শুনিবামাত্র শোভার বুক ভরা অশ্রুভার আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না,—বড় বড় ফোঁটা কিছুতেই আর বাগ্ মানিল না কেবলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। প্রফুল্লনাথ রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"বিবি, প্রাণ খুলে আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, দুঃখ করোনা, পৃথিবীর মত সহনশালিনী হও—তুমি নিশ্চয়ই সুখী হবে।"

শোভা কোন কথা কহিল না। ধীরে ধীরে যাইয়া প্রফুল্লনাথকে প্রনাম করিল। পায়ের ধূলা লইয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন একটা বৃহৎ মুক্তির অচঞ্চল শান্তি তাহার নিজত্বকে অকুণ্ঠিত উদার নির্ম্মল আলোকের সহিত

ব্যক্ত করিয়া দিল। একটা গভীর ভক্তি তাহার হৃদয়ের কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল। তাহার প্রাণের পূজা সমস্ত বিশ্বকে ধূপের পুণ্য গন্ধে পবিত্র করিল।

প্রফুল্লনাথের প্রাণের ভিতর তখন অনন্ত তুফান বহিতেছিল। প্রাণের ব্যথা মুখের উপর পরিস্ফুট হইবার চেষ্টা করিতে ছিল। তিনি জোর করিয়া কোনক্রমে তাহা প্রাণের ভিতর চাপিয়া লইয়া আর একটীও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাটা চাপা রহিল না। বিন্দুবাসিনী আহারের পর তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিত চশমাখানি চক্ষে দিয়া মহাভক্তিভরে রামায়ণখানি খুলিয়া বালি বধের পালাটা শেষ করিতেছিলেন। স্থানটী বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল ; শ্রীরামচন্দ্রের গুপ্তবাণে বালির মৃত্যু হইয়াছে সেই সংবাদ পাইয়া পাগলিনীর মত তাহার পত্নী তারা ছুটিয়া আসিয়াছে। সে স্বামীর এই অন্যায় মৃত্যুতে বিলাপ করিতেছে, আর শ্রীরামচন্দ্রকে নানাবিধ কটূক্তি করিতেছে। ভগবান্ ব্যথিতাকে সান্ত্বনা দিবার মত কোন কথাই খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তাই মহা অপ্রস্তুত হইয়া হেটমুণ্ডে বসিয়া আছেন।

সেই সময় বাটীর বামনদিদি আসিয়া বেশ একটু রং দিয়া কথাটা লাগসই করিয়া বলিল, "শুনেছ মা,—ও বাড়ীর দুর্লভ মিত্তিরের আস্পর্দ্ধার কথা। তিনি তার ছেলের সঙ্গে শুবির বিয়ে দেবেন, তাই শুবি আর এ বাড়ীতে আসতে পারবে না। কি স্পর্দ্ধার কথা মা,—শুনে অবধি আমার গাটা জ্বলে যাচ্ছে।"

নীহার মায়ের পার্শ্বে বসিয়া পশম বুনিতেছিল, সে তাহার বোনা বন্ধ করিয়া বলিল,—"ওমা! তাই বুঝি আজ দুদিন শুবি আমাদের বাড়ী আসেনি। ওমা, তা কি করে জানবো আমি; এদিকে আমি তার ওপর রেগেই মরছিলুম।"

বামনদিদি বলিল,—"তা সে ভদ্রলোকের বাছা, কি করে আসে বল দিদিমণি। তার বাপেরই বা তাতে অপরাধ কি। দুর্লভ মিত্তিরের ভয়ে সে বেচারী আড়ষ্ট। কিন্তু দিদিমণি আমি তোমায় হক কথা বলে দিচ্ছি, এ দুর্লভ মিত্তির ঘুরিয়ে আমাদেরই অপমান করেছে।"

নীহার গম্ভীরভাবে বলিল,—"কেন এতে আমাদের অপমান কিসে হ'লো?"

বামনদিদি তাহার গালে হাত দিয়া বলিল,—"ওমা দিদিমণি বলে কি! অপমান নয়? এত লোক থাকতে সে আমাদের নাম করে কেন? কোথাও যেতে মানা নেই, যত মানা আমাদের বাড়ীতে আসতে। ও কি কখনও আমাদের ভাল দেখতে পেরেছে দিদিমণি? বাবু বেঁচে থাকতেই—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে তাহার চক্ষে অঞ্চল দিল। বাবুর জন্য সেই পুরাতন শোকটা আবার তাহার যেন নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিল। চক্ষে জল বাহির হইয়াছিল কিনা সে

কথা হলপ করিয়া বলা যায় না, কিন্তু তাহার কণ্ঠের স্বরটা যে সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া গেল, তাহা না বলিবার কোনই উপায় নাই। তাহা বেশ একটু সুরে বাহির হইল,—"জিজ্ঞাসা করনা দিদিমণি, মা তো সব জানেন, কত ক্ষতি করবারই না চেষ্টা করেছে। বাবু বেঁচে থাকলে ওর সাধ্যি কি যে ও আমাদের এত বড় অপমানটা করে।"

সরল প্রাণ নীহার অবাক হইয়া বামনদিদির কথাগুলা শুনিতেছিল; সে তাহার মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিল,—"সত্যি মা দুর্লভবাবুর এ বড় অন্যায়। বিয়ে দিবি তো বিয়ে দিবি, এত কিসের! নিশ্চয়ই আমাদের অপমান করবার জন্যই শুবিকে আমাদের বাড়ী আসতে বারণ করেছে।"

রামায়ণখানি কোলে করিয়া বিন্দুবাসিনী এতক্ষণ নীরবে বসিয়া কন্যা ও বামন ঠাকুরুণের কথাগুলি শুনিতে ছিলেন। এক্ষণে রামায়ণ বন্ধ করিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার চক্ষের চসমা নামাইলেন। কথাটা শুনিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখখানি একেবারে অপ্রসন্ন হইয়া গিয়াছিল, তিনি বামন ঠাকুরুণের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বল্লে বামন ঠাকুরুণ?"

বামনদিদি বিন্দুবাসিনীর মুখের অপ্রসন্ন ভাব লক্ষ্য

করিয়াছিল, তাই সে একটু সঙ্কোচিত হইয়া বলিল,—"না মা এমন কিছু নয়। এই বলছিলুম কি, শুবির এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করাটা দুর্ল্লভবাবুর ভাল কাজ হয়নি। আমরা বাপু তোর কি ক্ষতি করেছি, আমাদের ওপর এত আক্রোশ কেন? বলতো মা, আজ যদি বাবু বেঁচে থাক্‌তেন, তা হ'লে কি ও আমাদের এত বড় অপমানটা কর্‌বার সাহস কর্ত্ত।"

বিন্দুবাসিনী শোভাকে নিজের কন্যার মতই স্নেহ করিতেন। সে তাঁহার বাড়ীতে আর আসিতে পাইবে না, এ কথা শুনিয়াও তিনি তত আঘাত পাইলেন না, যত আঘাত পাইলেন দুর্ল্লভ মিত্রের আচরণের কথাটায়। তাঁহার স্বামীর সহিত পূর্ব্ব শত্রুতার কথা মনে করিয়াই যে দুর্ল্লভ মিত্র শোভাকে এ বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। এ যে—ইচ্ছা করিয়াই কেবল তাঁহাদের অপমান করিবার জন্যই দুর্ল্লভ মিত্র শোভার এ বাড়ী আসা বন্ধ করিয়াছে, তাহাও তিনি বিলক্ষণ বুঝিলেন। বামন ঠাকুরুণের সেই কথাটা তখনও বিন্দুবাসিনীর কর্ণে বাজিতেছিল, "বাবু থাকলে তার সাধ্যি কি যে আমাদের এত বড় অপমানটা করে?"

তাঁহার মনে হইল, স্বামীতো তাঁহার পুত্র কন্যা, ঐশ্বর্য্য সমস্তই তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্তে চক্ষু মুদিয়াছেন।

তাঁহাকেই যে তিনি তাঁহার প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছেন। এখন সমস্ত মান অপমানের জন্য তিনিই যে সম্পূর্ণ দায়ী। তিনি তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারিতেছেন, আর বংশ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন না।

স্বামীর বংশ গৌরবে আঘাত লাগায় বিন্দুবাসিনীর ভিতরটা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সহসা একটা কথা সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। যাহা তাঁহার এক দিনের জন্যও মনে হয় নাই, যাহা মনে হইবারও কোন কারণ ছিল না, সেই কথাটাই যেন উদয় হইয়া তাঁহার স্বামীর গৌরবকে আরো উজ্জ্বল করিয়া দুর্লভ মিত্রের এ তেজের কথাটার মুখে একেবারে প্রস্তর প্রাচীর আঁটিয়া দিল। তিনি নীরবে রামায়ণখানি নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কন্যা ও বামনদিদি বিন্দুবাসিনীর অপ্রসন্ন গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না।

একখানা গদি-আটা ইজি চেয়ারের উপর পড়িয়া প্রফুল্ল-নাথ একখানি কি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। আজ দুই দিন হইতে তাঁহার মনের অবস্থা তত ভাল ছিল না। তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে আজ দুই দিন হইতে যেন একটা চিন্তার "কালোঝোরা" হু হু শব্দে আপন মনে বহিয়া

যাইতেছিল। তিনি সেই স্রোতটাকে নানারূপ কাজের গোলযোগের মধ্যে ফেলিয়া চাপা দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা থাকিয়া থাকিয়া সমস্ত চিন্তাটাকে ছাড়াইয়া উঠিতেছিল। কোন কাজেই মন বসিতে চাইতেছিল না। তাঁহার দুর্ব্বল মনের উপর সেই জন্য তাহার নিজের যেন ঘৃণা হইতেছিল।

"প্রফুল্ল!"

সহসা মাতার সুস্পষ্ট তীব্র আহ্বানে প্রফুল্লনাথ দ্বারের দিকে চাহিলেন,—দ্বারের সম্মুখে বিন্দুবাসিনী। জননীর মুখখানি যে আজ বড়ই অপ্রসন্ন প্রফুল্লনাথের দৃষ্টি তাহা এড়াইল না। তিনি একটু বিচলিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বিন্দুবাসিনী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন,—"বাবা, ঘরে কি বউ আনবিনি?"

এরূপ কথা জননীর নিকট শুনিবার জন্য প্রফুল্লনাথ একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। জননীর সহিত ইতিপূর্ব্বে কই তাঁহার বিবাহের কথাতো কখনও হয় নাই। সহসা আজ তবে এ কথা কোথা হইতে আসিল। জননী উত্তরের জন্য দাঁড়াইয়া আছেন, প্রফুল্লনাথ ভাবিবারও সময় পাইলেন না;—মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"মা! তুমি তো আমায় এ কথা কোন দিন জিজ্ঞাসা করনি?"

বিন্দুবাসিনীর কণ্ঠ অতি স্থির ; বলিলেন, "মানুষ কবে আছে কবে নেই। আমি এখন তোর একটা বিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্তে কাশীবাসী হতে পারি। আমি একটী কনে ঠিক করেছি, এখন তোর পছন্দ হ'লেই হয়।"

প্রফুল্লনাথ জননীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"মা, আমার পছন্দ! তুমি যেমনটী চাও আমি তেমনি একটী বউ এনে তোমার দাসী করে দেব। তোমার কোন বিষয়ে অমিল হবে,—তুমি দুঃখ পাবে,—এমন মেয়ে আমি কখনও ঘরে আনবো না।"

পুত্রের কথায় জননীর প্রাণ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরিয়া উঠিল। এমন পুত্রের তিনি জননী, এই ভাবিয়া গর্ব্বে তাহার হৃদয় স্ফীত হইল। তিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"বাবা আমি শোভার সঙ্গে তোর বিয়ে দেব স্থির করেছি। শুনলুম দুর্লভ-বাবু তাকে এ বাড়ীতে আসতে নিষেধ করেছেন। তাতে নিশ্চয়ই তার প্রাণ ভেঙ্গে গেছে। তুই জানিসনে প্রফুল্ল, মা আমায় কত ভালবাসে। তাকে আরতো আমি অমনি ডাকতে পারিনে বাবা! আমার বড় ইচ্ছে এবার তাকে বরণ করে ঘরে তুলবো।"

বিন্দুবাসিনীর স্বর ভঙ্গ হইল। প্রফুল্লনাথ জননীকে মর্ত্ত্যে মূর্ত্তিমতী প্রত্যক্ষ দেবীর মত ভক্তি করিতেন। তিনি জানিতেন,

জননী-পূজাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা, জননীর মুখখানি ম্লান দেখিলে প্রফুল্লনাথ সমস্ত বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখিতেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"মা! তুমি কি জান না, তোমার ইচ্ছেই আমার সকল আদেশের বড়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

পুত্রের গৃহ হইতে বিন্দুবাসিনী যখন বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার প্রাণের ভিতরে আনন্দের তরঙ্গ আশার বাতাসে নৃত্য করিতেছিল। বিবাহের কথাটা পুত্রের নিকট পাড়িবার পর হইতেই কার্য্যটা সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণটা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার যেন আর সবুর সহিতেছিল না। তিনি তখনই হরিচরণকে ডাকিয়া কথাটা শেষ করিতে চাহেন। তিনি যে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পুত্রের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আবার ধীরে ধীরে আসিয়া সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। নীহার ও বামনদিদি তখন পর্য্যন্তও সেই-স্থানেই বসিয়া ছিল। বিন্দুবাসিনীর সহসা নীরবে অমন করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার কারণটা কি, তাহারা এতক্ষণ ধরিয়া নানা সম্ভব অসম্ভব কথা তুলিয়া তাহারই একটা মীমাংসায় নিযুক্ত ছিল। বিন্দুবাসিনী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বামনঠাকুরুণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"যাও তো বামনঠাকুরুণ একবার শোভাদের বাড়ীতে,—শোভা কি প্রভা

যাকে হয় বলে এস, ঠাকুরপো আফিস থেকে এলেই যেন একবার আমার সঙ্গে দেখা করে।”

সহসা হরিচরণের এত জরুরী তলবের কারণটা কি বামনঠাকুরুণ বুঝিতে না পারিয়া বিন্দুবাসিনীর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল। নীহার জিজ্ঞাসা করিল,—“কেন মা, কাকাবাবুকে কি দরকার ?”

উত্তরটা শুনিবার জন্য বামনঠাকুরুণ তাহার কানটা যেন একটু সজাগ করিয়া তুলিল। শোভার কথাটা সেই আসিয়া এখানে প্রথম পাড়িয়াছিল, তাহার পর পুত্রের গৃহ হইতে ফিরিয়া বিন্দুবাসিনী যখন হরিচরণকে ডাকিয়া পাঠাইতেছেন, তখন নিশ্চয়ই সেই সম্বন্ধেই হরিচরণের সহিত কোন একটা কথা হইবে। কাজেই উত্তরটা শুনিবার জন্য বামনঠাকুরুণের আগ্রহটা কিছু অধিক পরিমাণে হওয়া একেবারেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিন্দুবাসিনী কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “শোভার সঙ্গে তোর দাদার বিয়ে দেব ভাব্‌ছি।”

বাল্যকাল হইতে এক সঙ্গে খেলা ধূলা করিয়া নীহার ও শোভার সখীত্ব সম্বন্ধটা রীতিমতই গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। জননীর কথায় নীহারের প্রাণটা একেবারে আনন্দে নাচিয়া উঠিল। গল্পগুজবের ভিতর ইঙ্গিত ইসারায় শোভার মনের ভাবটা নীহারের নিকট একেবারেই গোপন ছিল না। সে

হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তাহ'লে বেশ হয় মা,—শুবি সত্যিই দাদাকে বড় ভালবাসে।"

বিন্দুবাসিনী সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। বামন-ঠাকুরুণ কথাটা পাড়ায় রাষ্ট্র করিবার জন্য একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঘাড়টা নাড়িয়া বলিল, "তা যদি হয় মা, তা'হলে দুর্লভবাবুর মুখের মত হবে, থোতা মুখ একেবারে ভোঁতা হয়ে যাবে। যেমন শুবির এ বাড়ী আসা বন্ধ করেছেন, তেমনি জব্দ হবেন।"

বামনঠাকুরুণের যেন আর তর সহিতে ছিল না, সে বিন্দুবাসিনীর উত্তরটা পর্য্যন্ত শুনিবারও অপেক্ষা রাখিল না, কথাটা শেষ করিয়াই বিন্দুবাসিনীর হুকুম তামিল করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বিন্দুবাসিনী আবার রামায়ণ খুলিয়া বসিলেন।

রাত্রির অন্ধকার অবিচ্ছিন্ন মসীলেখায় সন্ধ্যাবধূর সোনার অঞ্চলে কালো পাড় টানিয়া দিল। কলিকাতার ছোট বড় সারি সারি অসংখ্য অট্টালিকাগুলির আলিসার উপর বায়সগণের সন্ধ্যা-সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। কাকারবে সভাপতিকে সম্ভাষণ করিয়া তাহারা নিজ নিজ বাসার অন্বেষণে ছুটিল। সন্ধ্যার শেষ স্বর্ণছায়া মিলাইয়া গেল। নবোদিত শুক্ল পক্ষের তরুণ চাঁদের মৃদু মধুর আলোক চারিদিকে ফুটিয়া পড়িল। বিন্দুবাসিনী

ছাদের উপর উৎকর্ণভাবে বসিয়া হরিচরণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। কথাটা হরিচরণের মুখে পাকা না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার যেন আর কোন কাজেই মন বসিতে ছিল না। আগ্রহের আতিশয্যে তাঁহার সমস্ত প্রাণটা একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। একাকী চাঁদের দিকে চাহিয়া বিন্দুবাসিনীর কত কথাই মনে উদয় হইতেছিল। সাদা সাদা পাতলা খণ্ড মেঘ একটার পর একটা আসিয়া চাঁদের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহাতে চাঁদের মধুর হাসি মাঝে মাঝে যেন ম্লান হইয়া পড়িতেছিল। বিন্দুবাসিনী ভাবিতে ছিলেন, ঠিক এই ভাবেই সংসারে অশ্রু ও হাসির ভিতর দিয়া এক দলের পর একদল আসিয়া অগ্রগামী দলের স্থান জুড়িয়া বসে,—তাহাদের কাজ শেষ হইলে আবার এক নূতন দলের অধিষ্ঠান হয়,—এইভাবে দলের পর দল, অনন্ত দল, অনন্ত কাল হইতে সংসারের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে;—তিনিও একদিন ঠিক এইরূপ ভাবেই দল বাঁধিয়া ছিলেন, তাঁহার দল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই আবার নূতন দলের অধিষ্ঠান হইবে। চিন্তার ভিতর দিয়া পুরাতন অনেক কথাই তাঁহার মনের দ্বারে আঘাত করিতেছিল,—পুরাতন অনেক স্মৃতিই প্রাণের মাঝে ভাসিয়া উঠিতেছিল,—আজ যেন সেগুলাকে ধুইয়া দিবার জন্য চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় নীহার

আসিয়া সংবাদ দিল,—"মা কাকাবাবু এসেছেন, তাঁকে কি এখানে ডেকে আন্‌বো ?"

কন্যার স্বর কর্ণে যাওয়ায় বিন্দুবাসিনী ফিরিলেন,—তিনি হরিচরণেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "চ—আমি যাচ্ছি।"

কন্যার সহিত বিন্দুবাসিনী ছাদ হইতে নামিয়া আসিলেন। হরিচরণ আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া সংবাদ পাইবামাত্র ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। দুর্লভ মিত্রের কাশী যাইবার পর হইতে তাহার যেন লুপ্তশক্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। কুভাবনা-গুলাকে দূর করিয়া দিয়া, এক্ষণে তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া শুভাবনা একেবারে স্বরাজ্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। বিন্দু-বাসিনীকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হরিচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেশ যেন একটু ব্যস্ততার ভাবে বলিলেন, "এই যে বৌঠান্,—আমি আফিস্ থেকে আসতেই প্রভা খবর দিলে, বামনঠাকুরুণ নাকি আমায় ডাকৃতে গেছ্‌লো। নানা গোলোযোগে একবার যে আসবো তারও ফুরশুধ করে উঠ্‌তে পারিনি। সময় তো আর বেশী নেই,—বিয়ের সমস্ত খুটিনাটি এর ভেতরেই যোগাড় করে ফেল্‌তে হবে।"

বিন্দুবাসিনী গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবেন, তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। সহসা

হরিচরণ নীরব হইতেই তিনি যেন একটু মুস্কিলে পড়িলেন। কথাটা পাড়িবার মত কোন কথাই তাঁহার ঠোঁটের আগায় জোগাইল না। তিনি ভিতরে ভিতরে যেন একটু অস্থির হইয়া উঠিলেন। নীহার জননীর সহিত গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল,—সে কথা কহিয়া সে বিপদ হইতে তাঁহাকে যেন পরিত্রাণ করিল। নীহার হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ কাকাবাবু! শুবি আর আমাদের বাড়ী আসে না কেন?"

হরিচরণের মুখে একটা ম্লান হাসি ভাসিয়া উঠিল,—তিনি যেন একটু অসংলগ্ন ভাবে নীহারের প্রশ্নের উত্তর দিলেন,—"আসবে বইকি, তোদের বাড়ী না এসে কি আর সে থাকতে পারে। সে রোজই তোদের বাড়ীর খবর নেয়।"

তাহার পর বিন্দুবাসিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"তবে কি জান বৌঠান্, বড়লোকে বড়লোকে একটু রেষারেষী হয়েই থাকে,—তার ওপর যদি তাদের বাস এক জায়গায় হয়। দুর্লভবাবুর সঙ্গে তোমাদের তো আর কোনদিনই সদ্ভাব নেই। শুবি দু'দিন বাদে সেই দুর্লভবাবুর বৌ হবে,—কাজেই তোমাদের বাড়ী তার আসা নিষেধ করেছেন। অবস্থায় সে আর কেমন করে আসে বল! সে তো তোমাদের বাড়ী আসবার জন্য দিন রাত ছট্‌ফট্ করছে।"

বিন্দুবাসিনীর হৃদয়ের ভিতরে যে মাতৃত্বের স্নেহরস শোভার জন্য লুক্কাইত ভাবে সঞ্চিত হইয়াছে,—হরিচরণের কথায় তাহা যেন একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া পর্য্যন্ত একটীও কথা কহেন নাই, কিন্তু আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। একেবারেই আসল কথা পাড়িলেন; অতি ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ঠাকুরপো, তোমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেম শোন। তোমাকে আমার একটী কথা রাখ্‌তেই হবে।"

হরিচরণ বিন্দুবাসিনীকে আর কথা কহিতে দিলেন না,—তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"বৌঠান্, অঘোরদার উপকার গুলো কি এরই মধ্যে ভোলা যায়। তোমার কথা রাখ্‌বো না তো কার কথা রাখ্‌বো! সে কথা যতই শক্ত হক্, আমি নিশ্চয়ই সম্পন্ন কর্‌বো তা' আর বল্‌তে হবে।"

বিন্দুবাসিনী নিশ্চয়ই জানিতেন যে হরিচরণ তাঁহার কথা কিছুতেই ঠেলিতে পারিবেন না। এ বিশ্বাস তাহার চিরদিনই দৃঢ় ছিল। হরিচরণ নীরব হইবা মাত্র তিনি আবার মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন,—"তা জানি ঠাকুরপো,—তোমার উপর জোর চলে বলেই যখন তখন তোমায় ডেকে পাঠাই। তা আমি কি স্থির করেছি শোন ঠাকুরপো,—আমি শোভার সঙ্গে প্রফুল্লের বিয়ে দেব ভাব্‌ছি। শোভা যে আর আমার বাড়ী আস্‌তে

পার্‌বে না তা আমি কিছুতেই সইতে পারবো না। তারই একটা ব্যবস্থা কর্‌বার জন্যই আজ আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।"

নিশীথরাত্রে সহসা ভূমিকম্পে লোক সুপ্তির কোল হইতে যে ভাবে জাগিয়া উঠে, হরিচরণও ঠিক সেই ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তিনি কিছুক্ষণ নির্ব্বাক অবস্থায় বিন্দুবাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যাহা তিনি কোনদিন কল্পনাও করেন নাই,—যাহা ভাবিতেও তাঁহার সাহস হয় নাই,—যাহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, সেই কথাটা বিন্দুবাসিনীর মুখ হইতে বাহির হওয়ায় তাঁহার দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। প্রথম বিস্ময়ের ভাবটা কাটিয়া গেলে, তাঁহার মুখ হইতে যেন একটা মহা আকুল আগ্রহে বাহির হইল, "কি বলছ্ বৌঠান্! শোভার সঙ্গে প্রফুল্লনাথের বিয়ে দেবে?"

হরিচরণের মুখ চোখের ভাব দেখিয়া বিন্দুবাসিনী একটু বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। হরিচরণের এ কথাটা জিজ্ঞাসা করিবার অর্থ কি,—তবে কি প্রফুল্লনাথের সহিত শোভার বিবাহ দিতে তাহার কোন আপত্তি আছে! বিন্দুবাসিনী অতি গাঢ়স্বরে হরিচরণের কথার উত্তর দিলেন,—"ঠাকুর-পো, যদি তোমার আপত্তি থাকে,—আমি তোমায় জোর কর্ত্তে চাইনি। আমার ছেলে—ঠিক আমি বল্‌তে পারিনে, তবে আমার খুব বিশ্বাস, দুর্ল্লভবাবুর ছেলের চেয়ে প্রফুল্ল খারাপ নয়!"

জননীর মুখে পুত্রের প্রশংসা যখন বাহির হইয়া আসে, তখন সেই কথাটা স্নিগ্ধ গভীর স্নেহরসে সমস্ত প্রাণটাকে একেবারে আলোড়িত করিয়া দেয়। তখন জননীর প্রাণ হর্ষে,—গর্ব্বে যেন এক স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে থাকে। বিন্দুবাসিনীরও তাহাই হইল ;--তিনি নীরব হইলেন। প্রথম বিস্ময়ের ধমকটায় হরিচরণ লাফাইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"না বৌঠান্, সে কথা আমি বলিনি। প্রফুল্লনাথ যে কত ভালো ছেলে, তার গুণ যে কত, তা আর আমার জানতে কিছু বাকি নেই। তবে—"

বিন্দুবাসিনী ভয়ঙ্কর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন,—তিনি হরিচরণকে বাধা দিয়া একটু ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তবে! তবে তোমার আর আপত্তি কি ঠাকুর-পো!"

কথাটার উত্তর দিতে হরিচরণের মুখটা একেবারে সাদা হইয়া গেল। যাহাকে তিনি পুত্রের অপেক্ষাও স্নেহ করেন, যাহার দেব সম চরিত্রের বর্ণনা তিনি শতমুখে করিয়াও তৃপ্তি পাইতেন না। শুধু একটুখানি কথার খেলাপ করিলেই সেই প্রফুল্লনাথ চিরদিনের মত আপনার হইয়া যায়। কন্যারও সুখের আর অবধি থাকে না। তাহার চক্ষের সম্মুখে মেদিনী যেন একাকার হইয়া বিরাট অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। কিন্তু তথাপি তিনি তাহার বিচলিত প্রাণটাকে প্রাণপণ শক্তিতে দৃঢ় করিলেন।

হেটমুণ্ডে জড়িত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"আপত্তি! প্রফুল্লনাথের সহিত শোভার বিয়ে হবে, এর চেয়ে আর সুখের কি হতে পারে! বৌঠান, কথাটা যদি আর অন্ততঃ পনের দিন আগে বল্‌তে,—আমি যে এখন দুর্লভবাবুকে কথা দিয়ে ফেলেছি। বুড়ো বয়সে শেষ কি কথার খেলাপ কর্ব্বো।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যুষের চা পান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রফুল্ল-নাথ একখানা চেয়ারে বসিয়া আর একখানা চেয়ারে পা তুলিয়া দিয়া গবাক্ষের সম্মুখে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। পার্শ্বস্থিত মারবেল টেবিলের উপর রক্ষিত অর্দ্ধ-পরিপূর্ণ চায়ের পেয়ালা হইতে বিন্দু বিন্দু ধুঁয়া বহির্গত হইয়া তাহা যে এখনও সম্পূর্ণ শীতল হইয়া যায় নাই তাহারাই প্রমাণ দিতেছিল। আজ প্রফুল্লনাথের সদাপ্রফুল্ল মুখখানার উপর চিন্তার একটা মসীরেখা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। হরিচরণবাবুর সহিত তাঁহার মাতার গত রাত্রে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছে, সে সংবাদ তিনি রাত্রেই পাইয়াছেন। হরিচরণবাবু যে শোভার সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছেন, সে কথাটাও তাঁহার নিকট অবিদিত নাই। উদাসভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি সেই সকল কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। কথাগুলা যতই তিনি নাড়িয়া চাড়িয়া বিশেষ ভাবে চিন্তা

করিতেছিলেন; তেই তাঁহার অনুশোচনায় সমস্ত প্রাণটা যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার কেবলই মনে হইতে ছিল শুধু একটুখানি তাঁহারই ভুলে, কাল মাতাকে এমনভাবে অপদস্থ হইতে হইয়াছে। তিনি তো জানিতেন শোভার সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ের উত্তাপ মাত্র সাধারণ বন্ধুত্বের রেখা ছাড়িয়া কত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। শুধু একটুখানি লজ্জার জন্য, সেটুকু পূর্ব্বে প্রকাশ না করিয়া তিনি যে তাঁহার সাক্ষাৎ দেবী স্বরূপিনী মাতার সহিত,—এমন কি নিজের সহিত পর্য্যন্ত কপটতা করিয়াছেন! পূর্ব্বে সেইটুকু প্রকাশ করিলে তাঁহাকে তো আজ এরূপ অপদস্থ হইতে হইত না। এইত কাল পর্য্যন্ত প্রফুল্লনাথ হরিচরণের পরিবারের বাহিরে ছিল, আজও সেই বাহিরেই রহিয়াছে। শুধু একটুখানি মেলামেশা,—শুধু পাশাপাশি আবাসের জন্য একটুখানি বন্ধুত্ব, তাহা পূর্ব্বেও যেমন ছিল, আজও ঠিক তেমনিই রহিয়াছে,—কিন্তু তবু একি প্রভেদ। সেই বাহির আজ এমন শূন্য কেন? তাঁহার পূর্ব্বের জীবনের তো কোন ক্ষতিই হয় নাই। তাঁহার চির আদরিণী ভগ্নি নীহার,—তাঁহার চির স্নেহময়ী মাতা বিন্দুবাসিনী সকলেই তো আছে। তথাপি তাঁহার মনে হইতে লাগিল, মাছকে যেন ডাঙ্গায় টানিয়া তোলা হইয়াছে। সে যে দিকে চাহিতেছে সব শূন্য,

কোথাও যেন তাহার জীবনের অবলম্বন নাই। এই রাশি রাশি সৌধ্য-শিখর পরিবেষ্টিত জনাকীর্ণ কলিকাতা সহরের সর্ব্বত্রই প্রফুল্লনাথ নিজের জীবনের একটা ছায়াময় পাণ্ডুর বর্ণ সর্ব্বনাশের চেহারা দেখিতে লাগিলেন। এই বিশ্বব্যাপী শুষ্কতায়, শূন্যতায় তিনি যেন নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কেন এমন হইল,—কি করিয়া এমন হইতে পারে,—কিসে ইহা সম্ভব হইল, সেই কথাটাই তিনি একটা হৃদয় হীন নিরুত্তর শূন্যের নিকট বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে ভৃত্য আসিয়া কখন যে তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা তিনি মোটেই জানিতে পারেন নাই, সহসা তাহার স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি একেবারে চমকিত হইয়া ফিরিয়া বসিলেন। বাবুকে ফিরিয়া বসিতে দেখিয়া সে বলিল, "বাবু বিশ্বনাথবাবু এসেছেন।"

"বিশ্বনাথ বাবু"! প্রফুল্লনাথের দেহের সমস্ত রক্ত যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হইতে চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "যা, বলগে আমি যাচ্ছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। প্রফুল্লনাথ চায়ের পেয়ালার বাকি চা-টুকু শেষ করিবার জন্য মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মানুষের প্রাণের রহস্য অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। বিশ্বনাথের নাম

শুনিবা মাত্র প্রফুল্লনাথের হৃদপিণ্ডের সমস্ত রক্ত যেন একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বনাথ শোভা সম্বন্ধেই যে কিছু বলিতে আসিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেটা যে কি তাহাই জানিবার জন্য প্রফুল্লনাথ মহা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি কোন ক্রমে চায়ের পেয়ালাটা নিঃশেষ করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন।

বিশ্বনাথ বাহিরের ঘরে একখানা চেয়ার দখল করিয়া প্রফুল্লনাথের অপেক্ষায় মহা উদ্‌গ্রীব ভাবে বসিয়াছিল! প্রফুল্লনাথকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া মহা ব্যস্তভাবে একেবারে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে প্রফুল্লনাথ ভায়া, আমি একবার তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চাই?"

প্রফুল্লনাথ অতি বিনীতভাবে তাড়াতাড়ি বলিলেন, "বসুন বসুন, উঠে দাঁড়ালেন কেন? আপনি মার সঙ্গে দেখা করবেন, তার আবার বল্‌বার কি আছে! বসুন আমি এখনি মাকে খবর দিচ্ছি?"

চেয়ার ছাড়িয়া যে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেটা বিশ্বনাথের মোটেই খেয়াল ছিল না। প্রফুল্লনাথের কথায় সে আবার তাড়াতাড়ি করিয়া চেয়ার-খানার উপর বসিয়া পড়িল। প্রফুল্লনাথ জোর করিয়া একটু মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ব্যাপার কি? হঠাৎ মার কাছে আপনার আসার কি দরকার হ'লো? সত্যই কি আমার মার সঙ্গে আপনার কোন দরকার আছে?"

বিশ্বনাথ সম্মুখস্থ টেবিলের উপর সজোরে একটা আঘাত করিয়া বলিলেন, "অতি অবশ্য আছে। একজন নিজের হাতে দড়ি পাকিয়ে নিজের গলায় দিতে চায়। আমি সেইটেই জোর করে বন্ধ কর্ত্তে চাই।"

প্রফুল্লনাথ একটু বিস্মিত ভাবে বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সে কি রকম, তাতে আমার মা কি কর্ব্বেন?"

"অতি অবশ্যই কিছু একটা কর্ব্বেন।" বিশ্বনাথ চেয়ার ছাড়িয়া পুনরায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যাহা বলিতে আসিয়াছিলেন, সেটাকে আর কিছুতেই কণ্ঠের ভিতর আটকাইয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। মহাব্যস্তভাবে একেবারে প্রফুল্লনাথের হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "ভায়া, তুমি ছেলে মানুষ, তুমি সে সব বুঝবে না। তুমি ভায়া শিগ্‌গির তোমার মাকে একবার খবর দাও। আমার যা বক্তব্য আমি তাঁর কাছে নিবেদন করি। আমার আর কিছুতেই সবুর সইছে না।"

বিশ্বনাথের ব্যস্ততা দেখিয়া প্রফুল্লনাথ একেবারে অবাক

হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি আবার তাহাকে কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিশ্বনাথ বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "আর কোন কথায় কাজ নেই। এই যে বল্লুম ভায়া তুমি সে সব বুঝিবে না। যাও যাও,—যাও একবার চটকরে তোমার মাকে একটু সংবাদ দাও।"

কোন কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা দেখিয়া প্রফুল্লনাথ বলিলেন, "তাহ'লে চলুন উপরে ?"

প্রফুল্লনাথ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বনাথ মহাব্যস্তভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ একেবারে আসিয়া প্রফুল্লনাথের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "তাহ'লে আপনি এইখানে একটু বসুন, আমি মাকে ডেকে আনি।"

বিশ্বনাথ একখানা গদি আটা চেয়ার টানিয়া তাহাতে বসিতে বসিতে বলিল, খুব ভালো। হাঁ ভায়া তুমি যাও আমার জন্যে কোন চিন্তা নেই, তোমার বাড়ী, এ যে আমার নিজের বাড়ী। তোমার মা, তিনি যে আমারও মা !"

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিন্দুবাসিনী পূজায় বসিয়াছিলেন ; প্রফুল্লনাথ পূজার ঘরের দরজায় চৌকাটের বাহিরে চটিজুতা খুলিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বলিলেন, মা বিশ্বনাথবাবু একবার আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান।"

বিন্দুবাসিনী কথা কহিলেন না, ইঙ্গিতে পুত্রকে সম্মুখে বসিতে বলিলেন। পূজার ঘরটী আগাগোড়া শ্বেত পাথরে সমস্ত বাঁধান। ঘরখানা বেশ প্রশস্ত, বিন্দুবাসিনীর স্বহস্তে ধৌত হওয়ায় পাথরগুলা দর্পণের ন্যায় ঝক্ ঝক্ করিতেছে। প্রফুল্লনাথ সেই মেজের উপর তাঁহার মাতার নিকট হইতে নিজেকে একটু পৃথক রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন। বিন্দুবাসিনী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাঁহার ইষ্টদেবীর জপ করিতে লাগিলেন, অস্থির চিত্তে প্রফুল্লনাথ মায়ের অপেক্ষায় মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন পুত্রকে তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বোধ হয় বিন্দুবাসিনী তাঁহার নিত্য পূজা সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি অঞ্চলে গলবেষ্টন করিয়া সেই মেজের

পর তিন চার বার মাথা ঠুকিয়া শেষ প্রণামটা শেষ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। মাতাকে চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিতে দেখিয়া প্রফুল্লনাথ আবার বলিলেন, "মা, তোমার পূজা শেষ হয়েছেতো, এখন চল একবার, বিশ্বনাথবাবু তোমার সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তে চান।"

বিশ্বনাথকে না দেখিলেও শোভার মুখে তাহার নাম বিন্দুবাসিনী বহুবার শুনিয়াছিলেন। সেই বিশ্বনাথ সহসা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায় কেন? বিন্দুবাসিনী এ 'কেন'র ভাল মীমাংসা করিতে পারিলেন না। পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে বিশ্বনাথ! এই আমাদের হরিচরণের বন্ধু?"

প্রফুল্লনাথ মাথাটা নাড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ?"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন,—"আমার সঙ্গে তাঁর কি দরকার? তিনি আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চান কেন?"

প্রফুল্লনাথ বলিলেন; "কেন যে তা আমি বল্‌তে পারিনি, মা। সেই 'কেন' যে কি, সেইটাই তো তোমায় বলবেন বলেই ডাকছেন!"

"চল।" বিন্দুবাসিনী পূজার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মাতাকে উঠিতে দেখিয়া প্রফুল্লনাথও তাড়াতাড়ি পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া চটি জোড়াটা পায়ে দিলেন।

কাল রাত্রি হইতে বিশ্বনাথের প্রাণের ভিতর মহীরাবণের যুদ্ধ চলিতেছিল, "কথা দিয়ে ফেলেছি কি করে ফেরাই বল" এই কথাটা হরিচরণের মুখ হইতে ঘুচাইতে না পারিয়া রাগের ধমকে কাল রাত্রে সে হরিচরণের মুখের উপর যা তা বলিয়া, তাহার বাড়ীতে আর জীবনে কখন আসিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। সে রাত্রে স্থির করিয়াছিল পরের জন্য আমার এত মাথা ব্যথার প্রয়োজন কি! আমি আর হরিচরণের কোন কথায়ই থাকিব না। কিন্তু করিব না বলিলেই যদি মানুষ না করিয়া থাকিতে পারিত তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক দুঃখই ঘুচিয়া যাইত। তাহা হইলে মানুষকে আর পদে পদে দুঃখ ডাকিয়া আনিতে হইত না। বিশ্বনাথের সম্বন্ধে ঠিক তাহাই হইল। ক্রোধের মাত্রাটা কমিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এক রত্তি মেয়ে শোভার অপরাধ কি? সে তাহার বাপের, শুধু একটা নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে কেন কষ্ট পাইবে? তাহার সহিত তো তাহার কোন বিদ্বেষ নাই। সে যে শোভাকে নিজের কন্যার অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করে! না তাহা কিছুতেই হইতে পারে না, সে কিছুতেই দুর্লভবাবুর পুত্রের সহিত শোভার বিবাহ দিতে দিবে না। যে উপায়েই হউক প্রফুল্লনাথের সহিত শোভার বিবাহ দিতেই হইবে!

নানা চিন্তার প্রবল তাড়নায় অনিদ্রায় কোন ক্রমে যে রাত্রিটা অতিবাহিত করিয়া অতি প্রত্যুষেই প্রফুল্লনাথের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যেমন করিয়া হউক, বিন্দুবাসিনীর হাতে পায়ে ধরিয়া শোভার বিবাহের একটা কিনারা করিবে। একটা হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বনাথ তাহার চঞ্চল প্রাণটাকে আর কিছুতেই সুস্থির করিতে পারিতেছিল না। একাকী বিন্দুবাসিনীর অপেক্ষায় শূন্য গৃহে চেয়ারের উপর স্থির হইয়া বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। সে গৃহের ভিতর পায়-চারী আরম্ভ করিয়া দিল।

জননীকে লইয়া প্রফুল্লনাথ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তিনি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "বিশ্বনাথবাবু মা এসেছেন ?"

বৈদ্যুতিক কলে যেন বিশ্বনাথের দেহটা ফিরিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের সম্মুখে বিন্দুবাসিনী। তিনি পূজার ঘর হইতে বরাবরই একেবারে পুত্রের সহিত পুত্রের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার পরিধানে তখনও সেই পূজার গরদের কাপড়, কণ্ঠে স্ফটিক ও তুলসীর মালা। বস্ত্রের অঞ্চল মস্তক ঢাকিয়া কণ্ঠ বেষ্টন করিয়াছে। কপালে গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা। বাঙ্গালীর অন্তঃপুরের পবিত্র মাতৃমূর্ত্তির প্রতি প্রথম দৃষ্টিতে

বিশ্বনাথের যেন মনে হইল আদ্যাশক্তির মায়ের এক সেবিকা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। আনন্দে ও ভক্তিতে বিশ্বনাথের প্রাণটা যেন একেবারে পবিত্র হইয়া গেল। সে কিছুতেই আর তাহার নিজের মাথাটাকে খাড়া রাখিতে পারিল না। সেটা যেন মায়ামন্ত্রে একেবারে মাটিতে নুইয়া পড়িল। সে সেইখানেই মেজের উপর মাথাটা ঠেকাইয়া বিন্দুবাসিনীকে একটা প্রকাণ্ড প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল;—এক নিশ্বাসে একেবারে বলিয়া ফেলিল, "মা হরিচরণের কথায় একেবারেই কাণ দেবেন না। আমি শোভার সঙ্গেই প্রফুল্লনাথের বিয়ে দেব, দেখি হরিচরণ কি করে তা আটকায়। কথা দিয়ে ফেলেছি বল্লেই অমনি কথা দেওয়া হ'লো। একি ছেলেখেলা। না তা কিছুতেই হবে না। এতে যা হবার হক। আমি শুধু এই কথাটাই আপনাকে নিবেদন কর্ত্তে এসেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এ বিয়ে আমি দেব, দেব—দেব। শুনুন্ মা আপনি যদি সহায় থাকেন আপনার যদি উৎসাহ পাই তবে আমি ও দুর্লভ ফুর্লভ মিত্তিরকে একদম গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। এখন শুধু আপনার একটু অভয়বাণী শুন্‌লেই আমি তার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক কর্ত্তে পারি।"

বিশ্বনাথের কথায় প্রফুল্লনাথের প্রাণের সমস্ত তার গুলা একেবারে এক সঙ্গে অভিমানের তীব্র কশাঘাতে হৃদয়ের

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা বিষাদ রাগিনী বাজিয়া উঠিল। জননীকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই তিনি উত্তর দিলেন, "সে কি করে হতে পারে। হরিচরণবাবু যখন কথা দিয়াছেন তখন আর সে কথা আমাদের তোলাই উচিত নয়—"

উত্তেজনার ধমকে বিশ্বনাথের কণ্ঠস্বর একেবারে সপ্তমে উঠিল, "ভাই তুমি চুপ কর। আমার যা বক্তব্য আমি আমার মার কাছে নিবেদন করেছি। আমি তাঁর কাছে উত্তর শুনতে চাই মা অভিমান করো না, দুঃখীর উপর অভিমান করে দেখ যেন অভিমানের মর্য্যাদা নষ্ট না হয়।"

বিশ্বনাথ আর কথা কহিতে পারিল না, আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল। সে কেবল একটা মিনতি পূর্ণ দৃষ্টি লইয়া বিন্দুবাসিনীর মুখের দিকে চাহিল। বিন্দুবাসিনী ঘরের সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন, এতক্ষণে কথা কহিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "মা কি কখন মেয়ের উপর অভিমান করে! হরিচরণ যে আমার নিজের ঠাকুরপোর চেয়েও বেশী; তার উপর কি আমার অভিমান সাজে? আমার ঘরে শোভার আসন চিরকালই শূন্য থাকবে। সে যখনই আসতে চাইবে আমি তখনই যে তাকে কোলে ক'রে তুলে নেব! কিন্তু তাব'লে সে যে তার বাপের সমস্ত অভিসম্পাৎ মাথায় করে

নিয়ে আসবে, তা আমি কেমন করে সহ্য করবো। বাবা ভগবানের উপর তো জোর চলে না। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হক; নিশ্চয়ই তাতে মঙ্গল হবে। আমার গলায় তুলসীর মালা রয়েছে, আমি সত্যি কথা বলিছি, অন্তর্য্যামি জানেন এতে আমার কোন অভিমান নেই।”

বিশ্বনাথ মহা উদ্‌গ্রীব ভাবে বিন্দুবাসিনীর কথাগুলা শুনিবার জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সহসা যেন তাহার চোখের সম্মুখে, হিন্দু গৃহ যাহাদের পুণ্যে, সৌন্দর্য্যে, প্রেমে মধুর ও পবিত্র হইয়া উঠে, সেই নারী প্রকৃতি বিন্দুবাসিনীর মূর্ত্তিতে পরিস্ফুট হইয়া তাহাকে একেবারে নির্ব্বাক করিয়া দিল।

———

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

—oo—

ঘরখানা একেবারে নিস্তব্ধের ভিতর চক্ষু মুদিয়া ছিল, হরিচরণের গাঢ় স্বরে সেটা যেন আবার চক্ষু মেলিয়া জাগিয়া উঠিল। হরিচরণ একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বিশ্বনাথ তুমিও শেষ আমার বাদী হলে ?"

বিশ্বনাথ তক্তাপোষের এক পার্শ্বে গবাক্ষের দিকে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। গৃহের এক কোণে প্রদীপের মিটি মিটি আলো গৃহের সম্পূর্ণ অন্ধকার দূরীভূত করিতে পারে নাই। কেবল অন্ধকারের কাল ছোপটা সরাইয়া দিয়াছিল। সেই অর্দ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহের ভিতর বিশ্বনাথের মেঘাচ্ছন্ন মুখখানা একেবারে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। প্রবল ঝড়ের পূর্ব্বে বিশ্ব প্রকৃতি যেমন স্তব্ধ হইয়া থাকে বিশ্বনাথও ঠিক সেই ভাবে স্তব্ধ হইয়াছিল। গবাক্ষের নিম্নেই রাজপথ,—রাজপথে লোক চলাচলের অভাব নাই। পরস্পর পরস্পরের সহিত কত কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। তাহাদের হাসি ঠাট্টা, আনন্দ উৎসাহের বিরাট

কোলাহলের দুই একটা কথা মাঝে মাঝে গৃহের ভিতর ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া গৃহটাকে যেন সচকিত করিয়া তুলিতেছিল। পৃথিবীতে যে একটা দুঃখ দৈন্য নিরাশা বলিয়া কিছু আছে রাজপথে তাহার কোনই লক্ষণ নাই। হরিচরণ বিশ্বনাথের মুখে একটা কোন উত্তরের আশায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল কিন্তু বিশ্বনাথ কথা কহিল না। সে কেবল একবার গৃহের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিল,—তাহার দৃষ্টি হরিচরণের পার্শ্বে উপবিষ্টা শোভা ও প্রভার উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণের ভিতর যেন সমস্ত দেহটাকে সচকিত করিয়া একটা বিদ্যুৎ চম্‌কাইয়া উঠিল। সে একটুখানি ঘুরিয়া একেবারে ভাল করিয়া গবাক্ষের দিকে ফিরিয়া বসিল। হরিচরণ একটু খানি নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "ছেলে আর মেয়ে, এ দুয়ের কি প্রভেদ জান বিশ্বনাথ?"

বিশ্বনাথ তথাপি নীরব, হরিচরণ বলিতে লাগিলেন, "ছেলেতে আর মেয়েতে তফাৎ হচ্ছে এই, ছেলে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে তার বাপের ভাগ্যের কতকটা অংশ গ্রহণ করে কিন্তু মেয়ে তা করে না। সে জন্মাবার সময় তার নিজের ভাগ্য সঙ্গে করে নিয়ে আসে। তার সুখ দুঃখের বোঝা সে নিজেই মাথায় করে নিয়ে আসে; তার মা বাপের সঙ্গে তার কোন

সম্পর্ক নেই। শোভাও তার বরাৎ নিয়েই জন্মেছে। হাজার চেষ্টা কল্লেও কি কেউ কারুর বরাৎ নিতে পারে। বিশ্বনাথ কিছু ভেব না,—যদি শোভার দুঃখ থাকে, ওকে সুখী করা যদি ভগবানের ইচ্ছা না হয়,—তুমি আমি হাজার চেষ্টা কল্লেও কি ওকে সুখী কর্ত্তে পারবো।”

বিশ্বনাথের সমস্ত দেহটা ফিরিয়া গেল, তাহার মুখ হইতে বন্দুকের গুলির মত বাহির হইয়া আসিল, “তবু মানুষ চেষ্টা করে। যক্ষ্মা হয়েছে, মৃত্যু স্থির নিশ্চিন্ত জানে তবু মানুষ কি চিকিৎসা কর্ত্তে ছাড়ে। বরাতে তার যাই থাক্ তা বলে বাপ মার যা কাজ তা বাপ মাকে কর্ত্তেই হবে। তোমার কর্ত্তব্য হচ্ছে যত দূর সম্ভব দেখে শুনে একটা সুপাত্রের হস্তে কন্যা অর্পণ করা। তারপর মেয়ের বরাতে যা আছে তাই হক্। তোমারও তাই চেষ্টা করা উচিত কিন্তু জেনে শুনে ভাল পাত্র থাকতেও এমন অসৎ পাত্রে মেয়ে দিতে আজ আমার বয়স এই ষাটের কাছাকাছি হলো এর ভেতর আমি আর কোন বাপকে দেখিনি। প্রফুল্লনাথের মা উপযাচক হয়ে প্রফুল্লনাথের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে, আর তুমি কি না তা অনায়াসে ছেড়ে দিয়ে এলে। তোমার মেয়ে তুমি যা ইচ্ছে তা কর্ত্তে পার কিন্তু ভাই আমার সঙ্গে তোমার এই পর্য্যন্ত।”

একটা প্রবল দীর্ঘশ্বাস সমস্ত বুকটা কাঁপাইয়া হরিচরণের নাশিকাপথে বাহির হইয়া আসিল। হরিচরণ বিশ্বনাথের কথায় সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া গাড় স্বরে কহিলেন, "বিশ্বনাথ তুমি জান না তুমি আমার বুকের কতখানি জায়গা জুড়ে রয়েছ। এক সঙ্গে এক স্কুলে পড়েছি, এক সঙ্গে সংসার পেতেছি, আবার এক সঙ্গেই প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে। তুমি একেবারে ঝাড়া হাত পা; আমার তবুও এক তিল অবশিষ্ট আছে। এ দুটোর বিয়ে হয়ে গেলেই তুমিও যা আমিও তা। এই ষাট বৎসর আমার জন্যে অনেক সহেছ, অনেক যন্ত্রণা পেয়েছ তখন এটাও সহ্য কর। ভগবানের উপর নির্ভর করে আমার আনন্দে আনন্দিত হও।"

হরিচরণের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। নয়ন কোণে এক ফোঁটা অশ্রু উছলিয়া উঠিল। হরিচরণ মস্তক অবনত করিলেন। বিশ্বনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। বন্ধুর নয়নের এক ফোঁটা অশ্রু তাহার প্রাণের সমস্ত দৃঢ়তা নষ্ট করিয়া দিল। তাহার আর আপত্তি করিবার কিছুই রহিল না। সে তাড়াতাড়ি তক্তপোষ হইতে নামিয়া তাহার তলদেশ হইতে একটা কলিকা বাহির করিল। তাহার পর আবার তক্তপোষের উপর উঠিয়া গবাক্ষের দিকে মুখ

করিয়া বসিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবার জন্য পকেট হইতে দেয়াশালাই বাহির করিল বিশ্বনাথ কলিকা হইতে একখানি অর্দ্ধ ভগ্ন টিকা তুলিয়া সবে মাত্র ধরাইতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে দরজা খুলিয়া প্রফুল্লনাথ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গৃহখানা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। গৃহের ভিতরকার সমস্ত দৃষ্টি এক কালে, এক সঙ্গে তাঁহার মুখের উপর পতিত হইল। শোভা চকিত দৃষ্টিতে একবার মাত্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ মস্তক নত করিয়া একেবারে মহা জড়সড় হইয়া পড়িল। হরিচরণ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "এস, প্রফুল্লনাথ এত দিন তোমায় দেখিনি কেন বাবা, খবর তো সব ভালো !"

প্রফুল্লনাথ ধীরে ধীরে আসিয়া অবনত মস্তকে তক্তপোষের এক পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। আজ প্রায় পনের ষোল দিন হইল তাঁহার সহিত আর শোভার সাক্ষাৎ হয় নাই। আজও হইবে সে আশাও তিনি করেন নাই। সহসা সম্মুখে শোভাকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের সমস্ত তার যেন একটা করুণ সুরে বাজিয়া উঠিল। আমার জিনিষকে আমার নয় ভাবিতে যে কত কষ্ট তাহা তাঁহার অন্তঃরস্থ অন্তর্য্যামীই কেবল বুঝিলেন। তিনি আর একবার বঙ্কিমভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার মনে হইল, সে মুখখানিতে

যেন আর সে হাস্যশ্রী নাই তাহা যেন একটা বিষাদ কালিমাঙ্ক একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বস্ব হারাণোর একটা পরিস্ফুট চিহ্ন তাহার সমস্ত মুখখানার উপর একেবারে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। শোভার মুখখানির দিকে চাহিয়া প্রফুল্লনাথ একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। প্রভাত স্বরে তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল, হরিচরণ নীরব হইবা মাত্র স জিজ্ঞাসা করিল, "প্রফুল্লদাদা, নীহার দিদি শ্বশুর বাড়ী চলে গেছে!"

প্রফুল্লনাথ জোর করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কষ্টে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "না, তোর নীহারদিদি কাল শ্বশুর বাড়ী যাবে।"

তাহার পর হরিচরণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কাকা-বাবু, আমি মাকে নিয়ে সোমবারে পুরী যাচ্ছি। এদানি তাঁর শরীরটা তত ভাল নেই। তাই স্থির করেছি দিন কতক তাঁকে নিয়ে পুরীতে থাক্‌বো। শোভার বিয়ের সময় হয়তো উপস্থিত থাক্‌তে পারবো না। কিন্তু তা ব'লে যেন আমাদের খবর দিতে ভুলবেন না।"

হরিচরণ মহা ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "সে কি কথা! তোমা-দের শোভার বিয়েতে না উপস্থিত থাক্‌লে চলে? তোমরাই যে আমার সব। তা ছাড়া শোভার মা নেই। তোমার মা না থাক্‌লেতো কোন কাজই হ'তে পারে না। না

বাবা তা হতেই পারে না, এ সময় তোমাদের কি কোথাও যাওয়া হয়! আর গেলেও সে সময় আস্‌তেই হবে।”

উপস্থিত থাকা তো চাই কিন্তু উপস্থিত থাকা কি সম্ভব! নিজের বলিদান নিজে কখন কি কেউ দেখিতে পারে? বাক্‌হীন অজ্ঞান ছাগও বলির পূর্ব্বে চক্ষু মুদ্রিত করে। প্রফুল্লনাথ নিজেকে দৃঢ় করিয়া বলিলেন, “কাকাবাবু সে সময় কি আমাদের উপস্থিত থাকা উচিত?”

হরিচরণবাবু জড়িত কণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলিলেন,—“কেন, কেন বাবা উচিত নয়?”

প্রফুল্লনাথ উঠিয়া দাড়াইয়াছিলেন; গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “বিবির বিয়েতে আমাদের উপস্থিত থাকাটা হয়তো দুর্ল্লভবাবুর আপত্তি হতে পারে! কাকাবাবু আপনি তো সবই জানেন, বাবার সঙ্গে দুর্ল্লভবাবুর কোন দিনই সদ্ভাব ছিল না। সে কথা আমরা ভুল্‌লেও দুর্ল্লভবাবু বোধ হয় এখন ভুলতে পারেননি। এখানে উপস্থিত থেকেও বিবির বিয়ের সময় আমরা উপস্থিত থাকৃতে পারবো না সেটা আমাদেরও কষ্ট আপনারও কষ্ট; তার চেয়ে আমাদের দূরে থাকাই ভালো। মাও আপনাকে সেই কথাই বল্‌তে বল্‌লেন।”

বিশ্বনাথ কলিকার আগুনটাকে বেশ করিয়া জমকাইয়া তুলিবার জন্য কলিকার উপর ধীরে ধীরে বাতাস করিতেছিল।

সে পাখাখানা এক পার্শ্বে ফেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "খুব ভালো কথা। প্রফুল্লনাথ চল আমিও তোমাদের সঙ্গে রওনা হব। যাতে আমার মতের মিল নেই তাতে উপস্থিত থাকা, আমারও চল্‌বে না। শেষ কি একটা ফ্যাসাদ করে বস্‌বো!"

প্রফুল্লনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি কোথায় যাবেন বিশ্বনাথবাবু! বিবির বিয়েতে আপনি না থাক্‌লে কি চলে। আপনি গেলে সব দেখ্‌বে শুন্‌বে কে?"

বিশ্বনাথ প্রফুল্লনাথের কথার উত্তরে আবার কি একটা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু হরিচরণ গাঢ়স্বরে বলিলেন, "তা হ'লে কি উঠ্‌লে বাবা!"

প্রফুল্লনাথ কেবল মাত্র বলিলেন, "হ্যাঁ কাকাবাবু, আজকে এখন আসি;—রাত অনেক হ'লো।"

হরিচরণ জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "আমার অবস্থাতো সবই বুঝ্‌ছো, কি আর বল্‌বো বাবা। বৌঠান্‌কে ব'লো আমার অবস্থা জেনে তিনি যেন আমার সমস্ত অপরাধ মাপ করেন।"

প্রফুল্লনাথ গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, দরজার নিকট হইতে ফিরিয়া বলিলেন, "যাবার আগে বিবিকে একবার মা দেখাতে বলেছেন। একবার দশ মিনিটের জন্যে তাকে

আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন। তাতে বোধ হয় দুর্লভ-বাবুর আপত্তি হবে না।"

হরিচরণ তাড়াতাড়ি কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু বিনোদ-লালকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি নীরব হইলেন। বিনোদলালকে দেখিয়া প্রফুল্লনাথের প্রাণটা যেন একটা তীব্র জ্বালায় ভরিয়া উঠিল। তিনি আর দাঁড়াইলেন না, তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বিনোদলালকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া হরিচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বিনোদলাল তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল, "এই যে শ্বশুর মশাই, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।"

সে দুই হাত জোড় করিয়া হরিচরণকে নমস্কার করিল; তাহার সমস্ত দেহটা বাকিয়া চুরিয়া হেলিয়া পড়িতেছিল, সে কিছুতেই আর সেটাকে সোজা করিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার গৃহ প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানা একেবারে সুরার তীব্র গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহার চক্ষু জড়িত;—মুখ দিয়া সুরার গন্ধ ভর ভর করিয়া বাহির হইতেছে। হরিচরণ মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন, "এস বাবাজি, বোস। আমার ঘরে তোমার উপযুক্ত এমন এক[illegible] নেই যে তোমায় বসাই।"

স্কন্ধের উপর অসংযত চাদরখানা মেজের উপর লুটাইতেছিল। বিনোদলাল সেখানা স্কন্ধের উপর ফেলিয়া তক্তপোষের একধারে আসিয়া ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল; বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "ব্যস্ত হবেন না শ্বশুর মশাই, এতে ব্যস্ত হবার এমন কিছু নেই;—আমি ঠিক আছি। বাবা চিঠি লিখেছেন দু'তিন দিনের মধ্যেই তিনি কল্‌কাতায় এসে পৌঁছিবেন। এই মাসেই দু'হাত এক হয়ে যাবে। শ্বশুর মশাই কেবল স্ফুর্ত্তি,—স্ফুর্ত্তি চালান।"

বিনোদলালের মুখের গন্ধে, কথার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া হরিচরণের একেবারে আক্কেল গুড়ুম হইয়া গিয়াছিল। মানুষের ধারণাটা যদি সহসা বদলাইয়া যায় তাহা হইলে তাহার অবস্থা যেমন শোচনীয় হয় হরিচরণের অবস্থাও কতকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি কি করিবেন, কি বলিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বিনোদলাল একটু নীরব থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; আবার জড়িত কণ্ঠে বলিল, "শ্বশুর মশাই আমাকে মাতাল ভাববেন না,—আমি ঠিক আছি। আপনার মেয়েকে আমি এত সুখে রাখবো,—তেমন সুখে তাকে আর কেউ রাখতে পারবে না। এক কখানা গয়না এক এক মোন ভারি হবে। হুঁ বাবা! গয়নার ভারে একেবারে নড়নচড়ন রহিত হয়ে যাবে।"

বিনোদ লাল আর দাঁড়াইল না,—আবার টলিতে টলিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বিশ্বনাথ এতক্ষণ নীরবে বসিয়া ভিতরে ভিতরে যেন একেবারে তুষের আগুনে জ্বলিতেছিল। বিনোদলাল গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র সে একেবারে বোমার মত ফাটিয়া উঠিল, "খুব সম্বন্ধ স্থির করেছ। আমি চল্লুম,—আর তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। তবে তোমার সঙ্গে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসরের আলাপ তাই যাবার সময় একটা সৎ পরামর্শ দিয়ে যাই। অমন সুপাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়েকে চিরদিনের মত দগ্ধে মরার চেয়ে হাত পা বেঁধে পোলের উপর থেকে একেবারে গঙ্গায় ফেলে দাওগে; তাতে তোমারও মঙ্গল তোমার মেয়ের মঙ্গল। উভয়েই নিশ্চিন্ত হবে।"

বিশ্বনাথ হরিচরণের আর কোন কথা শুনিবার অপেক্ষা পর্য্যন্ত রাখিল না। সে মুখ চোখ লাল করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কাশীতে দুর্লভবাবু যে বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন, সে বাড়ীখানি ঠিক দশাশ্বমেধ ঘাটের উপরেই। দ্বিতল কক্ষের গবাক্ষ হইতে গঙ্গা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভাত হইয়াছে, বিশ্বনাথের স্বর্ণমণ্ডিত মন্দির চূড়া, সূর্য্য কিরণে ঝক্‌মক্ করিতেছে। হর হর বোম্ বোম্ শব্দে কাশীবাসী ভোলানাথের ভক্তগণ সমস্ত কাশী মুখরিত করিয়া বিশ্বনাথের ঘুম ভাঙ্গাইতেছিল। দুর্লভবাবু তাঁহার দ্বিতল কক্ষের গবাক্ষের সম্মুখে একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া চা পান করিতেছিলেন। পার্শ্বে তাঁহার প্রকাণ্ড সটকার উপরিস্থিত অগ্নি সংযুক্ত কলিকা মৃদু বাতাসে ধীরে ধীরে আপনিই ধরিয়া উঠিতেছিল। সম্মুখে জাহ্নবী মৃদু হিল্লোলে আপন মনে বাহিয়া চলিয়াছে। তাহার সংখ্যাহীন অসংখ্য বীচিমালার উপর বাল সূর্য্যের প্রথম কিরণ যেন স্বর্ণ বৃষ্টি করিয়া নৃত্য করিতেছ। মাঝে মাঝে পাল তোলা নৌকা পালের ভরে মন্থর গমনে আপন গন্তব্য পথে চলিয়াছে। দুর্লভবাবু এক চুমুক চা পান করিতেছিলেন আর মাঝে

মাঝে প্রথম সূর্য্য সংস্পর্শ গঙ্গার অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন। সেই সময় বেহারা আসিয়া কয়েক খানা ডাকের চিঠি তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। দুর্লভবাবুর চা পান শেষ হইয়াছিল, তিনি চায়ের পেয়ালাটা মেঝের উপর রাখিয়া, পত্র কয়খানি উল্টাইয়া পাল্‌টাইয়া শিরনামাগুলি দেখিতে লাগিলেন। পত্রের শিরনামা দেখিয়া দুর্লভবাবু বুঝিলেন, পত্রগুলির সব কয়খানিই কলিকাতা হইতে আসিতেছে। তিনি কয়েকখানা জরুরী পত্র পড়িবার পর তাঁহার কন্যার পত্রখানা ধীরে ধীরে খুলিলেন।

প্রবাদ আছে বাতাসেরও কাণ আছে। বিন্দুবাসিনী যে হরিচরণকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনি যে শোভার সহিত তাঁহার পুত্র প্রফুল্লনাথের বিবাহ দিতে হরিচরণকে অনুরোধ করিয়াছেন, যথা সময়ে সে সমস্ত সংবাদই উমার কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। সে যখন শুনিল প্রফুল্লনাথের সহিত শোভার বিবাহের কথা হইতেছে তখন সে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার প্রথমেই মনে হইল কেবল প্রকারান্তরে তাহার পিতাকে অপমান করিবার জন্য বিন্দুবাসিনী প্রফুল্লনাথের সহিত শোভার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এত দিনতো কোন কথাই উঠে নাই। যেমন তাহার পিতা তাহার ভ্রাতার সহিত শোভার বিবাহ স্থির করিয়াছেন অমনই এসব কথা উঠিবার কারণ কি? কথাটা উমার কর্ণে পৌঁছিবা মাত্র তাহার আর এক মুহূর্ত্তও

বিলম্ব সহিল না। সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত কথা যতদূর সম্ভব সুবিস্তৃত করিয়া পিতাকে পত্র লিখিল। সেই দিনই যদি বিনোদলালের সহিত শোভার বিবাহ দেওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে সে সেই দিনই তাহা বোধ হয় শেষ করিয়া ফেলিত। তাহার আর এক মুহূর্ত্তও দেরী সহিতে ছিল না; কিন্তু তাহার কোনই উপায় নাই। দুর্ল্লভবাবু কলিকাতায় নাই; তিনি না আসা পর্য্যন্ত বিবাহ কিছুতেই হইতে পারে না। তাই সে অবিলম্বে তাহার পিতাকে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য একখানা পত্র লিখিল।

পত্রখানা পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ল্লভবাবুর মুখ চোখের ভাব নানাভাবে বিকৃত হইতে লাগিল। তিনি পত্রখানা দুই তিনবার মনে মনে পড়িয়াও বোধ হয় তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। উত্তেজনার ধমকে আবার বেশ একটু উচ্চৈঃস্বরে সেখানা পড়িতে লাগিলেন। পত্রে অধিক কিছু লেখা ছিল না মাত্র এই কয় লাইন লেখা ছিল ঃ—

শ্রীচরণেষু!

বাবা! আপনার পত্র পাইলাম। এখান হইতে যাইয়া কাশীতে যে আপনার শরীর বেশ সুস্থ আছে, পাঠে চিন্তা দূর হইল। এখানে হরিচরণবাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া নানা গোলযোগ বাধিয়াছে। শুনিলাম নাকি অঘোরবাবুর পত্নী তাঁহার পুত্রের সহিত [illegible]ভার বিবাহ দিতে চাহিতেছেন। প্রকারান্তরে

আমাদের কেবল অপমান ও অপ্রস্তুত করিবার জন্য ইহা যে তাঁহাদের একটা মতলব, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। এ অবস্থায় বিনোদের বিবাহ দিতে আর দেরী করা কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত নয়। আপনি পত্রপাঠ মাত্র একবার কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব বিনোদের বিবাহ শেষ করিয়া ফেলিবেন। আমরা এখানে সকলে ভাল আছি। অধিক আর কি লিখিব ;—আপনি পত্র পাঠ আর একদণ্ডও দেরী না করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিবেন। ইতি :—

সেবিকা—আপনার কন্যা উমা!

পত্র পড়া শেষ হইবামাত্র দুর্লভবাবুর প্রাণের ভিতর একটা প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পত্রখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া একবার দুইবার তিনবার চারবার পাঠ করিলেন। তথাপি তাঁহার যেন তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি হইল না। পত্রখানা যেন তাঁহার বুকের মধ্যস্থলে একটা বিষের তীর নিক্ষেপ করিয়া একটা মহা জ্বালার সৃষ্টি করিল। তিনি যতই পত্রের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া সমস্ত ঘর-খানাকে একেবারে জ্বালাইয়া দিবার জন্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে লাগিল। কন্যার পত্র পড়িয়া শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্ব্ব প্রথমেই মনে পড়িল, অঘোর বোসের [illegible]তার কথা।

তাঁহার পুরাতণ বিদ্বেষ যাহা কালের প্রভাবে বিস্মৃতির প্রলেফ খাইয়া একেবারে লুপ্ত হইবার মত হইয়াছিল তাহাই যেন আবার প্রাণ পাইয়া নব ভাবে প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠিল। অঘোর বোস যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন সে তাঁহাকে পদে পদে অপদস্থ করিবার জন্য শক্রুতা কি না করিয়াছে! তাঁহাকে অপদস্থ করিতে, তাঁহার সহিত শক্রুতা করিতে জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়াছে। কেবল তাহারই উৎসাহে তাঁহার শক্রুগণ তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছে। আজ কিনা আবার তাহার পত্নী তাঁহাকে অপদস্থ করিতে চায়! একটা বিশ বাইশ বৎসরের বালক ও একটা বিধবা স্ত্রালোকের নিকট যদি তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার আর পৃথিবীতে জীবিত থাকিয়া লাভ কি! দুর্লভ মিত্তির চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "না তাহা হইতেই পারে না,—দুর্লভ মিত্তির জীবিত থাকিতে প্রফুল্ল বোসের সাধ্য কি যে, সে হরিচরণের কন্যাকে বিবাহ করে! যেমন করিয়াই হউক এ বিবাহ রহিত করিতেই হইবে। ইহাতে যদি আমার সর্ব্বস্ব খোয়াইতে হয়,—তাহাও স্বীকার।"

দুর্লভ মিত্তির উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কাশীতে আর এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার কলিকাতায় উপস্থিত হইবার জন্য সমস্ত প্রাণটা আনচান্ করিতে লাগিল। তিনি গৃহের ভিতর পায়চারি আরম্ভ

করিয়া দিলেন। তিনি আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিতে ছিলেন না। প্রাণের ভিতর তখন তাঁহার চিন্তার অনন্ত তুফান ছুটিতেছিল। এক্ষণে কি করা উচিত কি করা অনুচিত সেই কথাটাই নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার প্রাণের ভিতর বিষ ছড়াইয়া তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল। দুর্লভবাবু নীরবে কিছুক্ষণ গৃহের ভিতর অস্থির ভাবে পায়চারি করিয়া চীৎকার করিয়া হাঁকিলেন, "গোবর্দ্ধন।"

দুর্লভবাবুর খাস খানসামা গোবর্দ্ধন দুলর্ভবাবুর সঙ্গে আসিয়াছিল। রাত্রের জড়তা মারিবার জন্য সে পার্শ্বের ঘরে বসিয়া নিশ্চিন্তে সবেমাত্র তাম্রকূটে দম লাগাইতে যাইতেছিল; সহসা বাবুর আহ্বান ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করায় সে একেবারে ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সেই স্থান হইতেই সাড়া দিল, "আজ্ঞে যাই।"

গোবর্দ্ধন তাড়াতাড়ি গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার ঘুমের তখনও জড়তা মরে নাই। সে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে একটা প্রকাণ্ড হাই তুলিল। দুর্লভবাবু বিরক্ত ভাবে পশ্চাৎ ফিরিলেন। তাঁহার দেহের প্রতি শিরা, অনুশিরা পর্য্যন্ত একেবারে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া ছিল। তিনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এখনি আমাকে কলকাতা রওনা হতে হবে। যা জিনিস পত্র সব বেঁধে ছেদে গুচিয়ে নিগে যা!"

গোবর্দ্ধন, বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। সে বাবুর রক্তবর্ণ চক্ষু, গম্ভীর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া বিশেষ ভীত হইয়া পড়িল। তাহার যখন বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র তখন হইতেই সে দুর্লভবাবুর বাড়ীতে চাকুরী করিতেছে। সে যত দুর্লভবাবুর মেজাজের গতিটা বুঝিত, তত বোধ হয় অপরে বুঝিত কিনা সন্দেহ। সে এই সুদীর্ঘ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর কাল দুর্লভবাবুর সৎ অসৎ অনেক কাজেই অনেক রকম মেজাজ দেখিয়া আসিতেছে। দেখিয়া দেখিয়া তাহার এমনি একটা ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে, বাবুর মেজাজ কখন কোন পর্য্যায় আছে সে বাবুকে দেখিবামাত্র বলিয়া দিতে পারিত। বাবুর মেজাজ দেখিয়া সে মহা ভীত হইয়া পড়িল, চক্ষু দুইটী মিট মিট করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "এখনি কি বেঁধে ছেদে নেব ?"

দুর্লভবাবুর ভিতরের অগ্নি যেন বাতাস পাইয়া একেবারে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "তবে ব্যাটা তোকে বল্লুম কি !"

গোবর্দ্ধন সঙ্কোচিত ভাবে মস্তক অবনত করিয়া পুনরায় বলিল, "আজ্ঞে এখন তো কোন ট্রেণ নেই।"

দুর্লভবাবু ফিরিয়াছিলেন ; তিনি গম্ভীর ভাবে মহা কঠোর স্বরে বলিলেন, "তোকে যা বল্‌ছি তুই তাই এখনি কর্গে যা।

আমি কোন কথা শুন্‌তে চাইনি। ট্রেণ থাকুক আর না থাকুক সে খবর রাখবার কোন প্রয়োজন নেই।"

গোবর্দ্ধন আর কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। বাবুর মেজাজ সহসা কেন এমন বেসুরা বেতালা বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার যথার্থ কারণটা যে কি তাহা সে অনেক চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিল না। নীরবে ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

গোবর্দ্ধন যাহা বলিয়াছিল কথাটা যথার্থই। তখন আর কোন ট্রেন ছিল না। সকালের ট্রেণ বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। কাজেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া দুর্লভবাবুকে কাশীতে অবস্থান করিতে হইল। সে দিনটা দুর্লভবাবু যে কি ভাবে কাটাইলেন তাহা তাঁহার কেবল অন্তঃরস্থ অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। দিনটা যেন আর কিছুতেই কাটিতে চাহিতে ছিল না। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল তাঁহার এই সমস্ত দিনটা এমন ভাবে কাশীতে নষ্ট হওয়ায় বুঝিবা সমস্ত উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যায়। অস্থির চিত্তে সমস্ত দিন ছটফট করিয়া সন্ধ্যার পরই দুর্লভবাবু কলিকাতার ট্রেণ ধরিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাহার একটু পূর্ব্বেই রজনীর অন্ধকার সমস্ত কাশীর উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্ক, ঘণ্টা, ঝাঝরের শব্দে পবিত্র কাশীর আকাশ বাতাস তখন একেবারে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। অন্ধকার

ঘরের লক্ষ্মী

রাত্রের কাল আকাশে তারার মালা, মণির মালার মত মিট মিট করিয়া জ্বলিয়া প্রকৃতি সতীর রূপের মাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। দুর্লভবাবুর সেদিকে দৃষ্টি নাই, তাহার মস্তিষ্কের ভিতর তখন কূটচক্র মাকড়সার জালের মত কেবলই ঘন হইতে ছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আজ রাত্রে বিন্দুবাসিনী পুত্রের সহিত পুরী যাত্রা করিবেন, প্রত্যূষ হইতে তাহারই আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন; কাজেই তাঁহার আহার করিতে বিলম্ব হইয়া গেল। তিনি যখন আহার শেষ করিয়া উপরে উঠিলেন তখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে সমস্ত কলিকাতা নগরী ঝা ঝা করিতেছে। শূন্য গৃহ,—গৃহে জনপ্রাণী নাই। কেবল কতকগুলা জড় পদার্থ আসবাবরূপে গৃহের চারিপার্শ্বে নির্জীব ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহের এক কোনে একখানি পাটি ছিল বিশ্ববাসিনী সেইখানি গৃহের মেজের উপরে পাতিয়া একটু বোধ হয় বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তাহার উপর উপবিষ্টা হইলেন। কাল নীহার শ্বশুরালয়ে চলিয়া গিয়াছে; কাল হইতে তাঁহার প্রাণটা বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছি। সেই শূন্যটা আজ যেন আর কিছুতেই পূর্ণ হইতে চাহিতেছিল না। নীহার শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবার পর হইতে একটা অভা[illegible] তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন। শোভা ও প্রভা [illegible]কাল হইতে

তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহারই স্নেহরসে সঞ্জীবিত হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারা দিবসের অধিকাংশ সময় তাঁহারই বাড়ীতে অতিবাহিত করিত। এই পাচ ছয় বৎসর কাল তাঁহার পাশে পাশে ঘুবিয়া তাহারা তাঁহার এত অধিক মায়া কাড়িয়া লইয়াছিল যে, এক মুহূর্ত্তও তিনি তাহাদের না দেখিযা থাকিতে পারিতেন না। এ কয় দিন নীহার থাকায় তিনি সে অভাবটা তত অধিক অনুভব করিতে পারেন নাই, কিন্তু নীহার শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবার পর হইতে সে অভাবটা এমন তীব্রভাবে তাঁহার প্রাণেব ভিতর প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠিয়া ছিল যে, তিনি কোন কার্য্যেই অগ্রসব হইতে পারিতেছিলেন না। কোন কাজেই আজ যেন আর তাঁহার মন বসিতে চাহিয়াছিল না। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল, শোভা তাঁহার নিকট আসিবার জন্য, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছটফট করিতেছে। কিন্তু তাহার আসিবার উপায় নাই ; পিতার নিষেধ সে কেমন করিয়া আসিবে ! তাহাতে শোভা প্রাণের ভিতর যে যন্ত্রণা পাইতেছিল, বিন্দুবাসিনীর সমস্ত প্রাণটা যেন তাহা উপলব্ধি করিতেছিল। পুরী যাইবার পূর্ব্বে তিনি একবার শোভাকে দেখিবেন বলিয়া পুত্রকে দিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁহার আহ্বান শুনিলে নিশ্চয় শোভা একবার না একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কা আসিবে কিন্তু আজ তিন দিন হইল প্রফুল্লনাথ

শোভাকে একবার তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবার জন্য হরিচরণকে বলিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তথাপি শোভা আসে নাই নিশ্চয়ই হরিচরণ তাহাকে আসিতে দেয় নাই, নতুবা সে কখন স্থির থাকিতে পারিত না। তাঁহার আহ্বান পাইবা মাত্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইত। সে যে তাঁহাকে মায়ের অধিক ভক্তি করে।

বিন্দুবাসিনী আবার উঠিলেন; পালঙ্কের উপর হইতে একটা বালিস টানিয়া আনিয়া সেই পাটির উপর ফেলিলেন। তাহার পর প্রাচীর গাত্রস্থ আলমারী খুলিয়া তাঁহার সেই চির প্রিয় রামায়ণ খানি ও স্বর্ণ মণ্ডিত চশমাখানি বাহির করিলেন। তিনি চশমা-খানি অঞ্চলে মুছিয়া চক্ষে দিতে যাইতেছিলেন সেই সময় নফরার মা ছুটিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে একগাল হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওমা,—শুভিদিদি এসেছে।"

আজ কয় দিন হইতে শোভার জন্য বিন্দুবাসিনীর সমস্ত প্রাণটা একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি নফরার মার মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুভি এসেছে! কই—কোথায়?"

নফরার মা হাসিয়া ঢলিয়া উত্তর দিল, "ওই যে গো তোমার দরজার আবডালে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে।"

বিন্দুবাসিনী বুঝিলেন শোভার এ সঙ্কোচ কি [illegible]র। তিনি

নফরার মাকে আর কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া তাড়াতাড়ি গৃহের দরজার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারের পার্শ্বেই শোভা নত মস্তকে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিন্দুবাসিনী যাইয়া সাদরে তাহার হাত ধরিলেন; অতি কোমলস্বরে বলিলেন, "দরজার পাশটীতে এমন জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন মা? কিসের লজ্জা! মায়ের কাছে কি মেয়ের লজ্জা আছে। তোরই সুখের জন্যে, তোরই মঙ্গলের জন্যে তোর বাবা আমাদের বাড়ীতে তোকে আসতে নিষেধ করেছে। এতে লজ্জার কি আছে বল। আয় ঘরের ভেতর আয়।"

স্নেহের মধুর স্পর্শে শোভার প্রাণটা যেন কণ্ঠকিত হইয়া উঠিল। কেমন যেন আপনা হইতে তাহার নয়ন কোনে অশ্রু উছলিয়া উঠিল। সে বিন্দুবাসিনীর কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। প্রাণপণ শক্তিতে নয়নের অশ্রু নয়নে গোপন করিয়া অতি সঙ্কোচিতভাবে জড়সড় হইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। বিন্দুবাসিনী শোভার হাত ধরিয়া তাহাকে সেই পাটির নিকট আনিয়া বলিলেন, "বোস, তারপর শুনি সব একে একে, কবে বিয়ে হবে, কি বিত্তান্ত। আজ কাল ঠাকুরপো আর আমাদের বাড়াতে মোটেই আসে না। কোন খবরও পাইনি। কবে বিয়ের দিন স্থির হলো?"

শোভা নীরব। কবে বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, শোভা

নিজেই তাহা অবগত নহে। সে বিন্দুবাসিনীর প্রশ্নের কি উত্তর দিবে! রাজ্যের লজ্জা তাহাকে একেবারে জড়সড় করিয়া দিল। বিন্দুবাসিনী পুনরায় বলিলেন, "এখন বুঝি দিন স্থির হয়নি। দুর্লভ মিত্তির কাশী থেকে ফির্‌লে তবে দিন স্থির হবে না?"

বিন্দুবাসিনী দুই তিন বার প্রশ্ন করিবার পর শোভা অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল, "তাতো আমি বলতে পারিনি।"

নফরার মা তখনও দাঁড়াইয়াছিল। শোভা নীরব হইবা মাত্র সে বলিয়া উঠিল, "হ্যাগা শুভিদিদি, তোমার মুখটি এমন মলিন কেন? শুভ কর্ম্মে কি এমন মুখটি মলিন কর্ত্তে আছে! আমাদের বিয়ের সময় তো আমোদে আমরা হেসেই খুন হয়েছিলুম।"

শোভার হইয়া বিন্দুবাসিনী উত্তর দিলেন, "পরের ঘরে যাবে, মুখ একটু চুণ হবে না। তোদের কথা আলাদা। ও ছেলে মানুষ কখনও বাপকে ছেড়ে একদিনও থাকেনি। সেই বাপের কাছছাড়া হয়ে থাক্‌তে হবে তার জন্যে কার না মন কেমন করে বল? তবে আমাদের মেয়ে ভাল, ও দু'দিনেই স্বামীর ঘর আপনার ঘর করে নিতে পারবে।"

নফরার মা মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "তা শুভিদিদি খুব পারবে, লোক বস্ কর্ত্তে শুভিদিদি খুব পারে। যাই আমার বাসনগুলো আবার পড়ে রয়েছে।"

নফরার মা গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। বিন্দুবাসিনী শোভার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যা একবার তোর প্রফুল্ল-দাদার সঙ্গে দেখা করে আয়গে। আমি আজ রাত্রিই তোর প্রফুল্লদাদার সঙ্গে পুরী যাচ্ছি। এতদিন তুই আমাদের ছিলি দু'দিন পরে পরের হবি. যাবার সময় একটু মিষ্টি মুখ করে যাস্। এখন তো তোকে আর যখন তখন এনে খাওয়াতে পারবো না।"

শোভা বিন্দুবাসিনীর কথায় কোন উত্তর দিল না,—মাথাটি নীচু করিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া রহিল। বিন্দুবাসিনী বলিতে লাগিলেন, "ভগবান যা করেন তা ভালর জন্যেই করেন। তাঁর কাজে কখন মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় না। তাই তাঁর আর এক নাম মঙ্গলময়। ভগবানের দান মাথায় পেতে নিতে হয়। দেখিস্ ভুলেও যেন মনের কোণে তাচ্ছিল্য না আসে। তিনি যাকে যা দেন তাই নিয়েই যদি সে সন্তুষ্ট থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে সুখী হয়। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সকলকে আপনার করে নিবি, সকলেই ভাল বাসবে তবেই তো বাপ মায়ের মুখ উজ্জ্বল হবে।"

শোভা তথাপি নীরব। বিন্দুবাসিনী একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, "যা আর দেরী করিস্‌নে, তোর প্রফুল্লদাদার সঙ্গে দেখা করে আয়গে! তাকে হয় তো এখনি আবার বেরুতে হবে। এখনও তার কি কি জিনিষ কিনতে বাকি আছে।"

বিন্দুবাসিনী তাহার স্বর্ণ মণ্ডিত চশমা খানি খাপ হইতে বাহির করিয়া আবার চক্ষে আটিলেন। তাহার পর রামায়ণ খানি খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "যা, তোর প্রফুল্লদাদা হয় তো ঘুমুচ্ছে, যা তাকে ডেকে তুলগে যা। বেলা পড়তেও আর বড় বেশী বাকি নেই। কি কি কিনতে হবে যাগ সকাল সকাল গিয়ে কিনে আসুগ্ গে।"

শোভা উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পা দুইটা তাহার যেন অগ্রসর হইতে চাহিল না। যাহার কাছে কাছে দিন রাত্র থাকিয়া সে বড় হইয়াছে, আজ তাহার নিকট উপস্থিত হইতে তাহার যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। রাজ্যের লজ্জা আজ প্রফুল্লনাথের নিকট উপস্থিত হইবার পথে যেন একটা সুদৃঢ় প্রাচীর আটিয়া দিয়াছে। সে প্রাচীর ভেদ করা ক্ষুদ্র শোভার পক্ষে মহা সুকঠিন ব্যাপার। কিন্তু এরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাও কিছুতেই আর হইতে পারে না। সে ধীরে ধীরে বিন্দুবাসিনীর গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রাণপণ শক্তিতে সেই প্রাচীর ভেদ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রফুল্ল নাথের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশ করিব মাত্র তাহার দৃষ্টি প্রফুল্লনাথের উপর পতিত হইল। প্রফুল্লনাথ একখানা সোফার উপর মাটির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া আছেন। শকুনীর কপট পাশায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া যুধিষ্ঠির যেমন পাষাণের মত স্তব্ধ

হইয়া বসিয়াছিলেন প্রফুল্লনাথও আজ সেইরূপ চৈতন্যহীন জড়ের মত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সর্ব্বস্ব হারানোর সুস্পষ্ট চিহ্ন তাহার মুখের উপর জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। শোভা তাহার এরূপ ভাব আর জীবনে কখন দেখেন নাই। প্রফুল্ল নাথেব মুখের দিকে চাহিয়া শোভার সমস্ত প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, তাহার যেন কেমন ভয় হইল; সে ধীরে ধীরে প্রফুল্লনাথের নিকটে যাইয়া দুই হস্তে তাঁহার একখানি হস্ত ধরিয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে প্রফুল্লদাদা,—তোমার কি কোন অসুখ করেছে?"

শোভার করস্পর্শে প্রফুল্লনাথের মুখে চোখে কতকটা সজীবতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কষ্টে মৃদু হাসিযা বলিলেন, "না কিছুতো হয়নি। এস বোস।"

শোভা ধীরে ধীরে আসিয়া সেই শোফার এক ধারে উপবিষ্টা হইল। প্রফুল্লনাথ ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, "আজ রাত্রের গাড়ীতেই আমি আমার মাকে নিয়ে পুরী যাচ্ছি, ফির্তে কিছুদিন দেরী হওয়াই সম্ভব। যদি কিছু দর্কার হয—আমার ঠিকানাটা নিয়ে রেখে দাও, আমায় সংবাদ দিও।"

কতবার কত তীর্থ করাইতে প্রফুল্লনাথ জননীকে লইয়া গিয়াছেন; প্রতিবারই শোভা তাহাদের সঙ্গে গিয়াছে। গমনের

কি হয়েছে প্রফুল্লদাদা,—তোমার কি কোন অসুখ করেছে ?

পৃষ্ঠা—১৩৪ ।

পূর্ব্বে,—গমনের আয়োজনের কত উৎসাহ,—কত আনন্দ! প্রফুল্লনাথের কথায়—আজ সেই সকল কথা একেবারে এক সঙ্গে শোভার প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠিয়া সমস্ত প্রাণটাকে আলোড়িত করিয়া দিল। শোভা কোন উত্তর দিতে পারিল না;—তাহার যেন কে কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। প্রফুল্লনাথ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নিজেকে একটু দৃঢ় করিয়া বলিলেন, "খুব সাবধানে থেকো। এমন কাজ কখন কোন দিন করো না যাতে লোকে প্রাণে কষ্ট পায়। সব দিক বজায় রেখে সব সহ্য করো। পৃথিবীতে বড় হ'তে গেলে অনেক সহ্য কর্ত্তে হয়। আর।—"

প্রফুল্লনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল,—তিনি যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা আর তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না। শোভা বিহ্বলার ন্যায় প্রফুল্লনাথের মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "আর! আর কি?"

একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস সমস্ত ঘরখানাকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া প্রফুল্লনাথের বক্ষস্থল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। তিনি নিজেকে আবার সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "না আর কিছু নয়। আচ্ছা এখন যাও। আমাকে আবার এখনি একবার বেরুতে হবে, এখনও অনেক জিনিষ পত্র কিনতে বাকি আছে।"

কিন্তু শোভা নড়িল না, সে অবনত মস্তকে বসিয়া প্রফুল্ল-নাথের অঙ্গুলিগুলি ধীরে ধীরে নাড়িতে লাগিল। কাহারও

মুখে কথা নাই,—উভয়েই নীরব। কেবল ব্রাকেটের উপরিস্থিত ঘড়ী টক্ টক্ করিয়া, এই যে তাহাদের উভয়ের শেষ সাক্ষাৎ তাহাই যেন স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। বহুক্ষণ কাহার মুখে কথা নাই সহসা শোভা তাহার মুখখানি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি কখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে না? তুমি পুরী থেকে কবে ফিরবে?"

প্রফুল্লনাথ শোভার মুখের দিকে চাহিলেন,—তাহার দুই চক্ষু জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়াছে। তিনি তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না,—জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "সম্ভব। যদি কখন ভগবানের ইচ্ছায় আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়—তখন যেন হিন্দু অন্তঃপুরের গরীয়সী মূর্ত্তি নিয়ে তুমি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িও। রোগীর সেবায়, তাপিতের সান্ত্বনায়, প্রেমের গৌরবে লক্ষ্মীরূপে যেন তোমায় দেখতে পাই। স্বামীর আশ্রয়ে—সংসার নিকেতনে শতদল পদ্মের সৌরভের মত তোমার গৌরব যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিবি, একথা কোন দিন যেন না শুনতে হয় তোমার কর্ত্তব্যে অবহেলা ঘটেছে।"

শোভা অবনত মস্তকে বসিয়াছিল, এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া আসিয়া প্রফুল্লনাথের হস্তের উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তিনি নীরব হইলেন। প্রফুল্লনাথ একবার মাত্র শোভার সেই

অশ্রুভরা মুখখানির প্রতি চাহিলেন। রূপের সৌন্দর্য্যে তাঁহার সমস্ত প্রাণ ভরিয়া গেল। তাহার যেন মনে হইল ভগবানের নিপুণ হস্তে তাহাতে রং ফলাইয়া সে মুখখানিতে স্বর্গীয় মাধুরী ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তাঁহার সমস্ত প্রাণ বিচলিত হইয়া উঠিল। শোভার অশ্রু তাহার নয়নে সংক্রামক হইবার উপক্রম হইল। তিনি আর শোভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না,—দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

দ্বারের সম্মুখেই বিন্দুবাসিনী। জননীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া প্রফুল্লনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বারের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া, তখন গলাটাকে একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "মা, আজ পুরী যাবার আগে তুমি বিবিকে আশীর্ব্বাদ করে যাও যেন সে সুখী হয়! আমি জানি তোমার আশীর্ব্বাদ কখন মিথ্যা হবার নয়।"

বিন্দুবাসিনী পুত্রের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াই শোভার নয়নের অশ্রু লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি তাহার নিকটে আসিয়া স্নেহভরে অঞ্চলে তাহার চক্ষুজল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "ছি মা কাঁদতে আছে। তুই তো আমাদের অবুঝ মেয়ে নোস,—তুই যে আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে। শ্বশুর বাড়ী যাবি, দশজনকে আপনার করে নিবি, এর চেয়ে আর বাঙ্গালীর মেয়ের বেশী কি সাধ আছে বল! এর জন্যে

কাঁদতে আছে,—ছি? নে—চ—উঠ, এদিকে আবার বেলা পড়ে এল।"

বিন্দুবাসিনীকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়াই শোভা তাহার চক্ষুজল চক্ষের ভিতর গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু অবাধ্য অশ্রু তাহার কোন মানাই মানিতে ছিল না। বিন্দুবাসিনীর কথায় ভীষণ লজ্জা আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিল। সে যতদূর সম্ভব, নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শোভাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া বিন্দুবাসিনী তাঁহার বস্ত্রের ভিতর হইতে কয়েকগাছি স্বর্ণনির্ম্মিত চুড়ি বাহির করিলেন। এই চুড়িগুলি বিন্দুবাসিনী অনেক সাধ করিয়া গড়াইয়াছিলেন কিন্তু অধিক দিন হস্তে দিতে পারেন নাই। এই চুড়ি গুলি গড়াইবার অল্পকাল পরেই অঘোরবাবুর মৃত্যু হয়। চুড়ি গুলি সেই পর্য্যন্তই বাক্সের ভিতর তোলা ছিল। চুড়িগুলি বাহির করিয়া বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "শোভার বিয়ের সময় আসতে পারি কিনা তারতো কোনই স্থির নেই, কিন্তু শোভার বিয়ের সময় আমায় যা'হক একটা কিছু দিয়ে যৌতুক কর্ত্তে হবেতো। তাই বুঝলি প্রফুল্ল, এই চুড়ি ক'গাছা আমি শোভাকে দিচ্ছি।"

প্রফুল্লনাথ বাহিরের দিকে চাহিয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। জননীর কথায় কোনই উত্তর দিল না। বিন্দুবাসিনী

শোভাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "নে শুভি এই চুড়ি ক'গাছি বিয়ের দিন্ পরিস্। আমি তোর মায়ের সমান আমি তোকে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, ভগবান কখনই তোকে অসুখী কর্‌বেন না।"

শোভা কোন কথা কহিতে পারিল না, কম্পিত হস্তে বিন্দুবাসিনীর হস্ত হইতে মহার্ঘ্য আশীর্ব্বাদ স্বরূপ সেই চুড়ি কয়গাছি গ্রহণ করিল। আশীর্ব্বাদের বিপুল ভারে তাহার মস্তক যেন আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িল। সে বিন্দুবাসিনীর পদধূলি মস্তকে স্পর্শ করিল। প্রফুল্লনাথ একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন, তাঁহার মনে হইল ভক্তি যেন স্নেহের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বাঙ্গালীর পবিত্র অন্তঃপুরের চির পবিত্র মহত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আনন্দ নিরানন্দের বৈমাত্র ভ্রাতা। নিরানন্দ যেস্থানে তাহার স্বরাজ্য বিস্তার করিয়া বসে, সেস্থানেই আনন্দ পার্শ্বে থাকিয়া বিদ্রূপ করিতে থাকে। মৃত্যুর তাণ্ডব নর্ত্তনে,—অভাবের দারুণ নিস্পীড়নে নিরানন্দ যেস্থানেই হাহাকার তুলিয়া ধরে তাহারই পার্শ্বে আনন্দ ঐশ্বর্য্যের মদগর্ব্বে,—লালসার নূপুর নিক্কনে স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা ছাড়িয়া দেয়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম,—ইহাই পৃথিবীর গতি। দুর্ল্লভ মিত্রের পুত্রের আচরণের কথা,—চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া হরিচরণ যখন আকুল হইয়া উঠিতেছিলেন তখন তাঁহারই পার্শ্বে দুর্ল্লভ মিত্রের দ্বিতলের সজ্জিত বৈঠকখানা গৃহে স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা ছুটিতেছিল। বাড়ীর মালিক বিদেশে, কাজেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনোদলালের একবারেই পাথরে পাঁচ কিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পিতা কাশী রওনা হইবার পর হইতেই সে আমোদের নদীতে তুফান তুলিয়া দিয়াছিল। আমোদ প্রমোদের মহা বিঘ্নকারক পিতা গৃহে থাকায় বিনোদলাল এত দিন একেবারে মন মরা হইয়াছিল, পিতা বাটী নাই সঙ্গে সঙ্গে স্ফূর্ত্তির

প্রতিবন্ধকও সমস্তই সরিয়া গিয়াছে। আজ বিনোদলালের প্রাণ একেবারে তর হইয়া গিয়াছে ;—আমোদ প্রমোদের জড় ও চেতন উপকরণ গুলি তাহার চারিপার্শ্বে লুটোপুটি খাইতেছে।

দুর্লভ মিত্রের দ্বিতলের সজ্জিত বৈঠকখানা যাহা বৎসরের অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে তাহা আজ উন্মুক্ত হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক গবাক্ষ উন্মুক্ত, ঘরের প্রত্যেক আলো, যেন আজ মালিককে সুস্পষ্ট করিবার জন্য সতেজে জ্বলিতেছে। ঘরখানার আগা গোড়া ফরাস পাতা,—ফরাসের উপর রাজহংসের পালকের ন্যায় শুভ্র চাদর পাতা। সেই ফরাসের উপর বিনোদলাল তাহার কয়েকজন বন্ধুবর্গ লইয়া উপবিষ্ট। সকলেই এক একটা তাকিয়া লইয়া নানা ভাবে ঠেস দিয়া বসিয়াছে। হাসির হর্‌রার, গানের তর্‌রার ভিতর দিয়া সুরা পাত্র মুহুর্মুহু হাতের পর হাত ঘুরিয়া আসিতেছে। গৃহের প্রত্যেক আস্‌বাব পত্র পর্যন্ত যেন আজ মস্‌গুল হইয়া উঠিয়াছে।

গৃহের এক পার্শ্বে একটা তাকিয়ার উপর আড় হইয়া পড়িয়া নন্দলাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গুড়গুড়ির নলে ধীরে ধীরে টান দিতে ছিল। সে চিরকাল দুর্লভবাবুর মোসাহেবী করিয়া আসিতেছে ; একেবারে তাঁহার পুত্র বিনোদলালের আসরের মাঝখানে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে খাড়া করিতে বোধ হয় অক্ষম হইয়াছিল,—হাজার হউক একটা চক্ষু লজ্জা যাইবে কোথায় ?

তাই সে মুরুব্বীর মত নিজেকে বেশ একটু পৃথক রাখিয়া মর্য্যাদাটা রক্ষা করিতেছিল। সে গুড়গুড়ির নলটা মুখ হইতে নামাইয়া বেশ একটু আমিরী ধরণে বলিয়া উঠিল, "এদিকে এক আধ গ্লাস ছাড় বাবা, আমি একবারে যে মিইয়ে এলুম বাবা। এক পাশে চুপটি করে পড়ে আছি, এক আধবার নেক নজরে নিও।"

বিনোদলালের ঠিক পার্শ্বে বসিয়া যে ব্যক্তি আসরটাকে একাই মাতাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে ছিল, সে তাহার মাথাটা নন্দলালের দিকে ফিরাইয়া বলিল, "মিইয়ে যাবার জোটী কি? বড় বাবুর বিয়ে,—মদের একেবারে অন্নছত্র হয়ে যাবে। নন্দলাল-বাবু, বিনোদবাবু কি আমাদের যে সে বাবু যে মিইয়ে যাবে। দুর্লভবাবুর কৃপণ কলঙ্কটা কেউ যদি ঘোচাতে পারে তা সে এই আমাদের বিনোদবাবু?"

একটু দূরে এক ব্যক্তি তাকিয়ার উপর দুই হাতে ভর দিয়া কোন ক্রমে বসিয়াছিল। তাহার মাথাটা একবারে মাটির দিকে ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। সে সেই ভাবেই বলিয়া উঠিল, "উপযুক্ত ছেলের কাজইতো হ'লো এই। সে কথা যাক এখন এক গ্লাস ঢাল। টাকা তো অনেকেরই আছে ভোগ কর্ত্তে জানে ক'জন;—যখের মত শুধু আগ্‌লেই মরে। এই যে পাশেই প্রফুল্লচন্দ্র আছেন, এর কি কখন ভাল হবে না ও কোন দিন

ভদ্রতা শিখ্‌বে। লোকের সঙ্গে যে মিশতে পারে না সে কি একটা লোক্‌, তাকে আমরা একেবারে ছুট্‌ আউট করে দিই।"

বিনোদলালের মুখেও একটা সটকার নল ছিল, সে তাড়াতাড়ি সেটা মুখ হইতে বাহির করিয়া মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "তারপর সে দিনের মজার কথাটা নন্দলালবাবু শুনেছেন বোধ হয়। ব্যাটার একেবারে থোতা মুখ ভোতা হয়ে গেছে।"

ফরাশে উপবিষ্ট সকলেই প্রায় একেবারে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "থোতা মুখ ভোতা না হয়ে যাবার যো কি; আপনার সঙ্গে কি কারুর কথা হ'তে পারে "

বিনোদলাল মাথাটা নাড়াইয়া একগাল হাসিয়া বলিল, "না—না—না। এ বেজায় মজা! শুনেছ আমাদের পাড়ার প্রফুল্লবাবু হরিচরণবাবুর মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে চায়। নন্দলালবাবু আস্পর্দ্ধার কথা শুনেছেন। তেমনি থোতা মুখ ভোতা হয়েছে। হারচরণবাবুকে যেমনি সেই কথা বলা অমনি একেবারে সাফ জবাব। তোমার মত মেন্তিমুখো ছেলের সঙ্গে আমি আমার মেযের বিয়ে কিছুতেই দিতে পারিনে।"

নন্দলাল নিজেকে তাকিয়া হইতে একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া, বিনোদলালের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তাই নাকি তা হ'লে তো ভারি মজা হয়ে গেছে। আপনার মত এমন সুপাত্র ফেলে

কেউ কখন কি অন্যের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে পারে ? দুর্লভ মিত্তিরের বড় ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়া অনেক পুণ্যের কাজ। এ কি তামাসার কথা।"

যে ব্যক্তি তাকিয়ার উপর ভর দিয়া মাটির দিকে ঝুকিয়া বসিয়াছিল সে আবার বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "বটেই তো,—পাত্রের গুণাগুণ দেখে আমারই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। এমন পাত্র কি আজ কালের বাজারে মেলে, না কেউ দেখেছে ?"

নন্দলাল তাকিয়াটা মাথায় দিয়া আড় হইয়া পড়িয়াছিল, সহসা একেবারে ধড়পড়িয়া উঠিয়া বসিল। সে যেন কি একটা শুনিবার জন্য দ্বারের দিকে কানটাকে খাড়া করিয়া দিল। নন্দলালকে সহসা বেতর ভাবে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া, সকলেই একেবারে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি ? নন্দলাল বাবু যে একেবারে লাফিয়ে উঠলেন ?"

যে ব্যক্তি মাটির দিকে ঝুকিয়া বসিয়াছিল, সে সেই ভাবেই বলিল, "কি বাবা, বিছে কামড়ালে নাকি ?"

নন্দলাল তাহার হাত দুইখান সম্মুখে বাড়াইয়া দিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, "চুপ ; নীচে যেন বাবুর গলা শুনলুম।"

"বাবুর গলা শুনলুম,—সে কি রকম !" বিনোদলালের পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই ব্যক্তি বিদ্যুতের মত তাহার মাথাটা নন্দলালের

দিকে ফিরাইয়া বলিল, "না নন্দলালবাবু, বুড়োর সঙ্গে এয়ারকি দিয়ে দিয়ে আপনি একেবারে বুড়োটে মেরে গেছেন। কথা নেই, বার্ত্তা নেই অমনি বাবুর গলা শুন্‌লেই হ'লো। বলা নেই, কওয়া নেই, ষ্টেশনে গাড়ী গেল না, অমনি বাবুর এলেই হ'লো? একি বাবা ছেলে খেলা! নাও—নাও নন্দলালবাবু আর এক গ্লাস জোর করে টেনে নাও।"

যে ব্যক্তি মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, সে তাহার ঘাড়টাকে একটু সোজা করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "এমন জমাটি মজলিস্ একেবারে মাটি কর্ত্তে চাও বাবা। অমন বেসুরে বেতালে ঘা দাও কেন বাবা, আমরা তোমার কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েছি বাপ?"

বিনোদলাল মাথাটা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বেশ একটু জোর করিয়া বলিল, "অসম্ভব! এ একেবারে কিছুতেই হতে পারে না। বাবা আজ কিছুতেই আস্‌তে পারেন না!"

বিনোদলালের কথাটা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই নন্দলাল ভীতি-পূর্ণ চাপা গলায় তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "আর আস্‌তে পারে না। নন্দলালের কাণ কি কখন ভুল শোনে। এ স্বর কি ভোলবার স্বর?"

সে গলার চাদরখানা খুলিয়া তাড়াতাড়ি আগাগোড়া মুড়ি দিয়া সটাং তাকিয়ার উপর মাথা দিয়া আড় হইয়া পড়িল। নন্দলালের

কণ্ঠস্বর, মুখের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বিনোদলালও বেশ একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি দ্বারের দিকে চাহিল। দ্বারের সম্মুখে চৌকাটের বাহিরেই দুর্লভবাবু। তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে।

দুর্লভবাবু যে গাড়ীতে কাশী হইতে রওনা হইয়াছিলেন তাহার কলিকাতায় পর দিন প্রত্যুষেই আশা উচিত ছিল, কিন্তু একখানা মালগাড়ী লাইনের উপর উল্‌টাইয়া পড়ায় তাঁহাদের গাড়ী দশ বার ঘণ্টা দানাপুরে দাঁড়াইয়াছিল। গাড়ী যখন হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিল তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। হাওড়ার ষ্টেশনের বৈদ্যুতিক আলো সবে মাত্র জ্বলিয়া উঠিয়া গোধূলীর অন্ধকার সরাইয়া দিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতে ছিল। কন্যার পত্র পাইয়াই দুর্লভবাবু কাশী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বাড়ীতে একখানা পত্র লিখিবারও অবসর পান নাই। কাজেই তাঁহাকে আনিবার জন্য তাঁহার বাড়ীর গাড়ী হাওড়ার ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে পারে নাই। তিনি ষ্টেশনে নামিয়া একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। গাড়ী দরজায় দাঁড়াইবামাত্র উপরের বৈঠকখানায় একটা হো হো হাসির শব্দ শুনিয়া তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। বাড়ীতে আজ এত হাসির ধূমের কারণটা কি জানিবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিলেন। হাসিটা

কোথা হইতে আসিতেছে শুনিবার জন্য তিনি উপরের দিকে চাহিলেন। উপরের বড় বৈঠকখানা গৃহের সমস্ত আলো জ্বলিতেছে,—সমস্ত গবাক্ষ উন্মুক্ত। কোন বিশেষ কাজ কর্ম্ম উপলক্ষেই কেবল এই বৈঠকখানা গৃহ খোলা হইত। এ বৈঠকখানা সহসা আজ খোলা হইল কেন? ব্যাপার কি! দুর্লভ বাবু একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। তিনি ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য একটু বিস্মিত ভাবে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। গাড়ী দরজায় দাঁড়াইবা মাত্র বাবু আসিয়াছেন এ সংবাদটা সর্ব্ব প্রথমই সরকার মহাশয়ের কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। সে বাবুকে আগাইয়া আনিবার জন্য দৈনিক হিসাব পত্রের খাতাপত্র বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিতে ছিল। সদর দরজার নিকটেই তাহার সহিত দুর্লভবাবুর সাক্ষাৎ হইল। সরকার মহাশয়কে দেখিয়া দুর্লভবাবু বিস্মিত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সব ব্যাপার কি? উপরের বৈঠক-খানা খোলা কেন?"

সরকার মহাশয় মহা বিপদে পড়িলেন। তাঁহার অবস্থাটা ঠিক মারীচের মত হইয়া দাঁড়াইল। একদিকে রাম, অন্যদিকে রাবণ, সে কি বলিবে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। সে কোন উত্তর দিতে পারিল না; অবনত মস্তকে, মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে লাগিল। কন্যার পত্র পাইবার পর হইতেই দুর্লভবাবুর

মেজাজটা একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছিল। সরকার মহাশয়ের ভাবে তিনি মহা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন ;—গম্ভীর কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে আজকাল কি তুমি একটু কাণে কম শুন্‌ছো নাকি ?"

সরকার মহাশয় মুখ তুলিয়া দুর্লভবাবুর মুখের দিকে চাহিল। দুর্লভবাবুর মুখের ভাব দেখিয়া তাহার বুকের ভিতর গুরগুর করিয়া উঠিল। সে আর নীরব থাকিতে পারিল না, অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে বড়বাবু,—আজ্ঞে বড়বাবু—"

দুর্লভবাবু কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "আজ্ঞে বড়বাবু,—আজ্ঞে বড়বাবু কি ?"

সরকার মহাশয় ভীতভাবে উত্তর দিল, "আজ্ঞে বড় বাবুর ক'জন বন্ধুবর্গ এসেছেন—তাই তিনি বড় বৈঠকখানা খুলেছেন—একটু আমোদ প্রমোদ——"

"হুঁ !" দুর্লভবাবু আর কোন কথা বলিলেন না,—সরকার মহাশয়কে পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি একেবারে বরাবর উপরের বড় বৈঠকখানার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দুর্লভবাবু গৃহের ভিতর যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সমস্ত দেহটা বারুদের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি তীব্র কটাক্ষে পুত্রের দিকে চাহিলেন। বিনোদলাল

সে চাউনি সহ্য করিতে পারিল না ;—তাহার মুখ শবের মুখের মত পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। কম্পিত হস্ত মদের গ্লাস্ ধরিয়া রাখিতে পারিল না তাহা হস্তচ্যুত হইল, সমস্ত মদ একেবারে ফরাশের উপর ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সুরার তীব্র গন্ধে সমস্ত ঘরখানা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রোধে দুর্লভবাবুর মুখখানা একেবারে লাল হইয়া গিয়াছিল। তিনি তীব্র স্বরে ডাকিলেন, "সরকার মশাই।"

সরকার মহাশয় দুর্লভবাবুর পশ্চাতেই দাঁড়াইয়াছিল,—সে কম্পিত দেহে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্লভবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "দরওয়ান দিয়ে ঘাড় ধরে এক এক ক'রে সব বাড়ী থেকে বার করে দাও,—এখনি বৈঠকখানা ঘরে চাবি লাগাও।'

দুর্লভবাবু আর এক মুহূর্ত্তও তথায় দাঁড়াইলেন না,—তিনি অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। বৈঠকখানার ভিতরস্থ সকলেই এতক্ষণ যেন একেবারে চৈতন্যবিহীন জড় পদার্থ হইয়া গিয়াছিল। দুর্লভবাবু চলিয়া যাইবামাত্র যেন মায়ামন্ত্রে যে যাহার চাদর লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যে ব্যক্তি মাটির দিকে ঝুকিয়া বসিয়াছিল, সেও টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, জড়িত কণ্ঠে বলিল, "আর দরওয়ানে কাজ কি বাবা! আমরা তার আগেই গা ভাসান দিচ্ছি। এমন এয়ারকির মাথায়

মারি বিশ ঝাড়ু। আমাদের কি এয়ারকি দেবার লোকের অভাব? অনেক সাধ্বী সাধনায় আমাদের মতন লোকের দর্শন পাওয়া যায়। এ বাবা একেবারে ভদ্রলোকের সন্তানদের নাজেহাল।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দুর্লভবাবুর সংসারের সমস্ত ব্যয়ই উমার হস্ত দিয়া হইত ;—দুর্লভবাবু কেবল খরচের টাকাটা মাসে মাসে তাহার হস্তে তুলিয়া দিতেন। তিনি কন্যাকেই তাঁহার সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমস্ত সংসারটা তাহারই হস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন। সন্ধ্যা আহ্নিক ও এই প্রকাণ্ড সংসারের কাজের মধ্যে নিজেকে মগ্ন করিয়া দিয়া উমা তাহার নিজের মন্দ অদৃষ্টের কথা, একেবারে না হউক, কতকটা ভুলিয়া ছিল। সন্ধ্যার পর সে তাহার কক্ষের মেজের উপর বসিয়া সমস্ত দিনের খরচটা একে একে মনে করিয়া একটা খাতায় তুলিতেছিল, সেই সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "দিদিবাবু! বাবু এসেছেন।"

উমা হেট হইয়া বসিয়া খাতায় লিখিতেছিল, সে মাথাটা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে বাবা এসেছেন! কখন এলেন?"

দাসী গালে হাত দিয়া বলিল, "এইমাত্র দিদিবাবুগো,—এইমাত্র। বাবু যেমন এসে গাড়ী থেকে নেমেছেন অমনি একটা রাম রাবণের লড়াই বেধে গেল। রাগে বাবুর মুখ

চোখ লাল হয়ে গেছে। বাবুর মুখের দিকে চেয়ে আমার তো দিদিবাবু ভয়ে বুকটা একেবারে ধড়ফড়িয়ে উঠেছে। আমি ছুটে তোমায় খবর দিতে এলুম।"

পিতা গৃহে পদার্পণ করিবা মাত্র সহসা আবার কিসের লড়াই বাধিল। উমা তাহার কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিল না। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া দাসীর মুখের দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লড়াই বেঁধে গেল? সে কিরে, কার সঙ্গে লড়াই বাধলো?"

দাসী বিকৃত স্বরে উত্তর দিল, "সে দুঃখের কথা আর কি বল্‌বো দিদিবাবু, লড়াই বাধতো বাধ একেবারে বড় দাদাবাবুর সঙ্গে। বড়দাদাবাবু তার ক'জন ইয়ার নিয়ে বড়বৈঠক-খানা ঘরে বসে একটু বোতোল খেয়ে আমোদ করছিলেন। বাবু দেখেতো একেবারে চটেই লাল। তিনি সবাইকেই দুর দুর করে তাড়িয়ে দিয়ে বৈঠকখানায় চাবি দিতে হুকুম দিলেন। তারপর দিদিমণি, রাগে একেবারে গস্ গস্ কর্ত্তে কর্ত্তে ওপরে উঠে এলেন।"

দাসীর কথায় উমা ব্যাপারটা যে কতকটা না বুঝিল তাহা নহে। সে দাসীকে আর কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়াই বিদায় করিয়া দিল। দাসী চলিয়া যাইবা মাত্র সে তাহার সেই ক্ষুদ্র হিসাবের খাতাখানি একটী ক্যাস বাক্সের ভিতর

তুলিয়া রাখিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিল, সেই সময় ভৃত্য গোবর্দ্ধন আসিয়া সংবাদ দিল, "দিদিমণি,—বাবু আপনাকে ডাকছেন।"

উমা গোবর্দ্ধনের কথায় কোনরূপ উত্তর দিল না। সে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি নিজের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পিতার গৃহের দিকে চলিয়া গেল।

দুর্লভবাবু ঘরের ঠিক মাঝখানে একখানা বেতের মোড়ার উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন। ট্রেণের কাপড় পর্য্যন্ত তখন তাঁহার ছাড়া হয় নাই। গাড়ীতে সমস্ত রাস্তা তিনি যে সকল চিন্তা করিয়া আসিয়াছিলেন, বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার সে সমস্ত একেবারে ওলোট পালোট হইয়া গিয়াছে। যাহার বিবাহের ব্যবস্থার জন্য তিনি কাশী হইতে ছুটিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাকে কেমন করিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবেন, সেইটাই তাঁহার প্রধান চিন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাশী যাইবার পূর্ব্বে পুত্র তাঁহার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিল তাহাতেই আর তাহার মুখ দেখা উচিত ছিল না, কিন্তু কন্যার অনুরোধে তিনি তাহাও তাহার মাপ করিয়াছিলেন। এবার তাহাকে আর মাপ করা একেবারেই অসম্ভব। যে পুত্র পিতার নিষেধ সত্ত্বেও একমাস নিজেকে সংযত রাখিতে পারে না, ভবিষ্যতে তাহার পরিণাম যে কি তাহা তিনি

চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছিলেন। পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, যাহার দ্বারা বংশের নাম উজ্জ্বল হইবার কথা তাহার যে এতদূর অধঃপতন হইতে পারে, দুর্ল্লভবাবু তাহা কোন দিন কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। পুত্র যদি অপুত্র হয় তাহা হইলে তাহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। এরূপ পুত্রকে প্রশ্রয় দিয়া তিনি কিছুতেই বংশের মুখে চূণ কালি লেপিতে পারেন না।

কন্যার পদশব্দে দুর্লভবাবু দ্বারের দিকে চাহিলেন। উমা ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সে পিতার সম্মুখে আসিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা, তুমি এখন কাপড় জামা ছাড়নি? কখনতো এসেছ, মুখ হাত ধোয়ার জল দিতে বলবো? গোবর্দ্ধন গেল কোথায়?"

গোবর্দ্ধন দ্বারের পার্শ্বেই বাবুর কাপড়, ফতুয়া, তোয়ালে লইয়া, দাঁড়াইয়াছিল। সে তাহার গলাটাকে গৃহের ভিতর কতকটা প্রবেশ করাইয়া দিয়া বেশ একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এই যে দিদিমণি, আমি কাপড় তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি। গোছল ঘরে জল দেওয়া হয়েছে।"

দুর্লভবাবু কন্যাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাগটাকে কণ্ঠের নিম্নে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টায় ছিলেন। তিনি নিজেকে বেশ একটু সংযত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে

বলিলেন, "যা, ওইখানে কাপড় তোয়ালে রেখে, তামাক নিয়ে আয়গে যা।"

গোবর্দ্ধন তামাক আনিতে চলিয়া গেল। উমা পিতার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "বাবা আমার চিঠি পেয়েছিলেন?"

দুর্লভবাবু মাথাটা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ মা তোমার চিঠি পেয়েছিলেম। তোমার চিঠি পেয়েই বিনোদের বিয়ের জন্য এত তাড়াতাড়ি আমি কল্‌কাতায় এসেছিলুম কিন্তু বাড়ী ঢুকে যা দেখলুম তাতে আর একদণ্ডও এখানে থাকৃতে ইচ্ছে হচ্ছে না। ছেলে যদি ছেলের মত না হয় তাহ'লে সে ছেলের মরণই মঙ্গল।"

উমা বিনোদলালের আচরণের কতক আভাষ পাইয়াছিল তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন বাবা, বিনোদ কি আপনার সঙ্গে কোন কুব্যবহার করেছে?"

দুর্লভবাবু কন্যার আপাদ মস্তক একবার তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "কু-আচরণ—সু-আচরণ এর মধ্যে কিছু নেই মা। মুখ্যু যে, সে আবার ভাল মন্দ ব্যবহার করবে কি! আমার ছেলে যে এত কদর্য্য হতে পারে তা আমার একেবারে ধারণাই ছিল না। নিজের ছেলের দোষ মানুষ দেখতে পায় না, এইটাই মানুষের সর্ব্ব

প্রধান দোষ। যাক্, যে উচ্ছন্ন যাবে তাকে ধরে রাখতে কেউ পারে না। তবে এইটুকু জেনে রেখ মা, বিনোদ তোমার ভাই হ'লেও সে আমার ছেলে নয়, আজ থেকে তার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।"

দুর্লভবাবু নীরব হইলেন,—উমা অবনত মস্তকে একটু-খানি নীরব থাকিয়া বেশ একটু গাঢ় স্বরে বলিল, "বাবা বিনোদের ওপর রাগ করে হরিচরণবাবুকে বিপদে ফেলিবেন না। তিনি তো আপনার সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নি! তিনি আপনার কথার ওপর নির্ভর করে অঘোরবাবুর স্ত্রী যখন তাঁর ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাতেও তিনি অস্বীকৃত হয়ে চলে এসেছেন। এখন যদি তার মেয়ের সহিত বিনোদের বিয়ে না দেন তা হ'লে তাঁকে মহা বিপদগ্রস্ত করা হয়। একজনের দোষে আর একজন নিরীহ ব্যাচারী কষ্ট পাবে কেন বাবা?"

দুর্লভবাবু অন্য দিকে মুখ করিয়া অবনত মস্তকে বসিয়া ছিলেন, সহসা মুখ ফিরাইয়া কন্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মা, আমি কেবল তোমারই অনুরোধে সে বার বিনোদকে মাপ করেছিলেম কিন্তু আর মাপ করবো না। আমার ছেলে আমি জানি তার কত দৌড়। তাকে যাবার আগে তাই কেবল, সে পারে কিনা পরীক্ষা করবার জন্যে এক মাস

সংযত থাক্‌তে বলেছিলুম। কিন্তু সে আমার সে কথা একেবারে গ্রাহ্যের ভেতরই আনেনি। আমি বেঁচে থাক্‌তেই যে এত উচ্ছৃঙ্খল, আমি মরবার পর যে কি হবে তাকি মা বুঝতে পাচ্ছ না। আমার এত কষ্টের টাকা, যে দু'দিনে উড়িয়ে দেবে তার হাতে তুলে দিয়ে যাব এও কি সম্ভব!"

গোবর্দ্ধন গুড়গুড়ির উপর কলিকা বসাইয়া তাহাতে ফু' দিতে দিতে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। দুর্লভবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যা সরকার মশাইকে শিগ্‌গির ডেকে দিগে যা?"

গোবর্দ্ধন গুড়গুড়িটা বাবুর সম্মুখে বসাইয়া, বাবুর হস্তে তাহার নলটা দিয়া প্রস্থান করিল। উমা ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা, বিনোদের বিয়ে দিন, বিয়ে দিলে সে নিশ্চয়ই শুধ্‌রে যাবে। তখন সংসারে একটা—"

দুর্লভবাবু কন্যার কথায় মাঝখানেই বাধা দিলেন;—গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "ভুল, সে কথা একবারও মনে স্থান দিও না মা। যে শুধরুবার সে আপনিই শুধরোয়, আর যে শুধ্‌-রোবার নয় তার হাজার বিয়ে দিলেও শুধরুবে না। সে যাক্‌ আমি জেনে শুনে এক মাতালের হাতে এক গরীবের মেয়েকে অর্পণ করে চিরদিনের মত তার স্বামী সুখ হ'তে বঞ্চিত কর্ত্তে পারব না। হরিচরণকে যখন কথা দিয়েছি

তখন তার মেয়ের বিয়ের ভার আমার ওপর। তুমি আমার বড় মেয়ে তোমার জানা উচিত, আমাকে লোকে বদ্‌মাইস, জোচ্চর, যা ইচ্ছে বলতে পারে কিন্তু দুর্লভ মিত্তির নীচ নয়। সে বাদরের গলায় কখন মুক্তার মালা পরিয়ে দেবে না। বিনোদের বিয়ের বিষয় আর আমায় কোন অনুরোধ করো না। আমি কি ঠিক করলুম শোন মা, আমি নীরোদের সঙ্গে হরিচরণের মেয়ের বিয়ে দেব।"

দুর্লভবাবু অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া গুড়গুড়ির নলটায় তাড়াতাড়ি কয়েকটা টান দিলেন। উমা তাহার পিতাকে চিনিত। সে আর তাঁহাকে কোনরূপ অনুরোধ করা বৃথা জানিয়া নীরবে পিতার সম্মুখে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। ভ্রাতার পরিণাম ভাবিয়া তাহার নয়নে জল আসিল। বাবুর আহ্বান পাইবামাত্র বৃদ্ধ সরকার কম্পিত হৃদয়ে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। দুর্লভবাবু গুড়গুড়ির নলটা মুখ হইতে বাহির করিয়া সরকার মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোটবাবু এখন কোথায় আছে, তার কোন খবর রাখ?"

বৃদ্ধ সরকার কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি ওয়ালটার থেকে আজ দু'দিন হ'লো পুরীতে এসেছেন।"

দুর্লভবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "কাল সকালেই তাঁকে

"মা তোমার চেয়ে বড় পৃথিবীতে আর আমার কে আছে মা!"

পৃষ্ঠা—১[illegible]।

তাঁহার তীব্র দৃষ্টি যেন মায়ের বুকের ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল। শোভা ও প্রভার অভাব তাঁহাকে কতখানি কাতর করিয়াছে তাহাও তিনি বুঝিলেন। অতি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "মা, তোমার যদি এখানে থাক্‌বার অসুবিধে হয়, চ'ল কল্‌কাতায় না হয় ফিরে যাই। তোমার যেখানে অসুবিধে হবে সেখানটা যদি স্বর্গ হয় তাহ'লেও তো আমি সেখানে এক দিনও থাকৃতে রাজি নই। মা তোমার চেয়ে বড় পৃথিবীতে আর আমার কে আছে মা!"

প্রাণের ভিতর অনেক সময় এমন অনেক বেদনা উপস্থিত হয়, যাহা মনের অগোচর হইয়া দাঁড়ায়। মানুষ বুঝিতে পারে না কেন প্রাণ অস্থির হইয়াছে কিন্তু তথাপি প্রাণ অস্থির হইতে ছাড়ে না। সেইরূপ একটা অজানিত বেদনা বিন্দুবাসিনীর প্রাণের ভিতর আজ কয়েক দিন হইতে চলা ফেরা করিতে ছিল। পুত্রের কথায় সেইটায় যেন আবার আঘাত পাইয়া নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। বিন্দুবাসিনী আর চক্ষের জল ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রফুল্লনাথ মায়ের চক্ষের জল কোন দিনই সহ্য করিতে পারিতেন না, মায়ের চক্ষে জল দেখিয়া তাঁহার সমস্ত প্রাণটা যেন একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। তিনি একটা গাঢ় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন। বিন্দুবাসিনী অঞ্চলে

চক্ষু জল মুছিতে মুছিতে অতি গাঢ় স্বরে বলিলেন, "কেন জানিনে আজ ক'দিন থেকে আমার মনটা বড় অস্থির হয়েছে। এখন যদি তোর বিয়ে দিয়ে ঘরে একটী বৌ আন্‌তে পারি তবু তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে তাকে নিয়ে একটু সুস্থির হতে পারবো। চ' তিন চার যায়গায়তো তোর বিয়ের সম্বন্ধ স্থিরই আছে; তাই ভাবছি এই ক'দিনের মধ্যেই যেখানে হয় এক যায়গায় তোর বিয়ে দিয়ে একটী বৌ ঘরে আনি। এ মাস গেলে আবার অকাল পড়বে তখন আবার তিন চার মাস বিয়ে হবে না।"

প্রফুল্লনাথ আকাশের দিকে চাহিলেন,—বিদ্যুতের মত একজনের মলিন বিশুষ্ক মুখ তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। তিনি অতি ক্ষীণ কণ্ঠে মায়ের প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "তোমার যা ইচ্ছে তাই হবে মা। তাহ'লে চল কল্‌কাতায়ই ফিরে যাই।"

বিন্দুবাসিনী কোন কথা কহিলেন না, তিনি নীল সিন্ধুর তরঙ্গের দিকে চাহিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রফুল্লনাথ সাহস করিয়া মায়ের মুখের দিকে চোখ ফিরাইতে পারিলেন না, যে দিকে চাহিয়াছিলেন সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। বিন্দুবাসিনী সহসা পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হ্যারে প্রফুল্ল কল্‌কাতা থেকে কোন চিঠি

পত্র পেলি,—শুভির কবে বিয়ের দিন স্থির হ'লো তার কিছু জানতে টান্‌তে পারলি ?”

একটা অতি ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস সান্ধ্য-সমীরণে মিশিয়া গেল। প্রফুল্লনাথ উদাসভাবে উত্তর দিলেন, “কই মা, তার তো কিছু খবর পাইনি ?”

বিন্দুবাসিনী গাঢ় স্বরে বলিলেন, “এত দিনে ভূপতি-বাবু নিশ্চয়ই কল্‌কাতায় ফিরেছেন। দু'এক দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই শুভির বিয়ে হবে ?”

সহসা প্রফুল্লনাথ মুখ ফিরাইয়া বেশ একটু আগ্রহ স্বরে প্রশ্ন করিলেন, “দু'এক দিনের মধ্যেই হবে নাকি ?”

পুত্রের কথায় বিন্দুবাসিনী পুত্রের প্রাণের আকুলতা প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন ; তিনি গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, “তা আর হবে না নিশ্চয়ই হবে। দেরী হবার আর তো কোন কারণ নেই। সবই যখন ঠিকঠাক তখন আর দেরী হবে কেন বল্‌। এতদিনও যদি না হয়ে থাকে, দু'একদিনের মধ্যে যে হবে তার আর কোনই সন্দেহ নেই।”

প্রফুল্লনাথ নীরবে মায়ের কথা শুনিতেছিলেন, তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন। মায়ের কথায় কোন উত্তর দিলেন না। বিন্দুবাসিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার আরম্ভ করিলেন, “ওই এক মেয়ে,—নিজে একটু চেয়ে চিন্তে যে থাবে

তাও সে পারে না। তার মার মরবার পর থেকে সে আমাকেই তার মা বলে জানে। তার যা কিছু আবদার সবই আমার কাছে। সেই কথাটাই আমার দিন রাত মনে হচ্ছে,—সেই মেয়েটার এখন কি হচ্ছে তাকে তো কেউ পুচ্‌বেও না বুঝবেও না। সে না খেয়ে খেয়েই দেখছি মরে যাবে।"

বিন্দুবাসিনী আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি নীরব হইলেন। মায়ের কথায় প্রফুল্ল নাথের সমস্ত প্রাণটা আলোড়িত হইয়া উঠিতেছিল। নির্জ্জীব ভালবাসা যেন সজীব হইয়া শাঁখের করাতের মত তাহার প্রাণের ভিতরটা কুচি কুচি করিতে লাগিল। ভালবাসা প্রাণের ভিতর একবার রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিলে, তাঁহার শক্তি যে কতদূর ছড়াইয়া পড়ে আজ প্রফুল্লনাথ তাহা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে ছিলেন। তাঁহার প্রাণের দৃঢ় শক্তি,—তাঁহার ধৈর্য্য, তাঁহার শিক্ষা, ভালবাসার প্রবল তাড়নায় সমস্তই চুরমার হইবার মত হইল। তিনি বিহ্বলের মত মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার মনে হইল আকাশ বাতাস,—নীল সমুদ্র, সমস্ত পৃথিবী চারিপাশ হইতে তাহার কাণের পার্শ্বে একটা করুণ সুরে গান ধরিয়া দিয়াছে। সে রাগিনীর প্রতি শব্দে যে সুর ধ্বনিত হইতে ছিল, তাহাতে প্রফুল্লনাথ নিজেকে আর স্থির রাখিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার

ভিতরটা কেমন আনচান করিয়া উঠিল, তিনি দাঁড়াইলেন।

বাড়ীর সম্মুখে সমুদ্রের চরের বালির উপর দিয়া দুই ব্যক্তি হাসিতে হাসেতে আপন মনে গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইতে ছিল। প্রফুল্লনাথ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইবা মাত্র তাঁহার দৃষ্টি তাহাদের উপর পতিত হইল। তিনি তাহাদের লক্ষ করিবা-মাত্র যেন বেশ একটু বিস্মিত হইয়া জননীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মা, ঐ দেখ দুর্ল্লভবাবুর ছোট ছেলে নীরোদ যাচ্ছে।"

পুত্রের কথায় বিন্দুবাসিনী বেশ একটু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কই ডাক্‌না তাকে। সে নিশ্চয়ই শুভির বিয়ে করে হবে কি বিভ্রান্ত সব জনে। যানা তাকে একবার ডেকে নিয়ে আয় না। ওর কাছে নিশ্চয়ই কল্‌কাতার অনেক খবর শুন্‌তে পাব।"

জননীর আগ্র আতিশায্য দেখিয়া প্রফুল্লনাথ তখনি একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া দুর্ল্লভবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র নিরোদকে ডাকিয়া আনিতে পাঠাইলেন। বাবুর আদেশ পাইয়া ভৃত্য যখন ছুটিয়া গিয়া তাহাদের ধরিল, তখন তাহারা সে বাড়ী ফেলিয়া অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। ভৃত্যের মুখে প্রফুল্ল-নাথের নাম শুনিয়া নীরোদ দাঁড়াইল এবং সেইখান হইতেই তাহার পার্শ্বস্থিত বন্ধুকে বিদায় করিয়া দিয়া সে ভৃত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রফুল্লনাথের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল

নাথ নীরোদকে আসিতে দেখিয়া রক হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিলেন। নীরোদ প্রফুল্লনাথকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, "একি প্রফুল্লবাবু যে! কবে এলেন। বাড়ীর সব সংবাদ ভালতো?"

প্রফুল্লনাথ, নীরোদের প্রশ্নের অতি সংক্ষেপে উত্তর দিয়া বলিলেন, "তারপর তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ! হঠাৎ পুরীতে কি মনে ক'রে! চল মা তোমায় ডাক্‌ছেন। তোমার সঙ্গে তাঁর কি একটা দরকার আছে।"

"মাও এয়েছেন বুঝি, প্রফুল্লদা ব্যাপার কি,—হঠাৎ সব পুরীতে যে?" নিরোদ, প্রফুল্লনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইল। প্রফুল্লনাথও আর কোন কথা না বলিয়া নীরোদকে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিবার জন্য সিড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

বিন্দুবাসিনী তখন আকাশের দিকে চাহিয়া সেই রোয়াকের উপরে স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। পুত্রের সহিত নীরোদকে আসিতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মস্তকে একটু কাপড় টানিয়া দিলেন। নীরোদ রোয়াকের উপর উঠিয়া বিন্দুবাসিনীকে সম্মুখে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "এই যে মা, আপনার পায়ের ধূলো অনেক দিন পাইনি, একটু পায়ের ধূলো দিন।"

মাথাটা নীচু করিয়া নীরোদ বিন্দুবাসিনীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রফুল্লনাথ একখানা চেয়ার টানিয়া

নীরোদের সম্মুখে আনিলেন। বিন্দুবাসিনী গাঢ় স্বরে বলিলেন, "এস বাবা বোস্, রাজ রাজেশ্বর হও।"

নীরোদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "বহুদিন পরে মায়ের আশীর্ব্বাদ পাওয়া গেল। রাজ-রাজেশ্বর না হই, অন্ততঃ মায়ের প্রজা নিশ্চয়ই হতে পারবো।"

নীরোদের কথায় বিন্দুবাসিনীর চিন্তা ক্লিষ্ট মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি মৃদুস্বরে আবার প্রশ্ন করিলেন, "তারপর বাবা, হঠাৎ এ সময় পুরী এলে যে, এদিকে কোন কাজ কর্ম্ম ছিল নাকি?"

নীরোদ তখন চেয়ারখানার উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল, "তুমিতো জানই মা বাবার সঙ্গে আমার কোন দিনই মতের মিল নেই। কাজেই মার মরবার পর থেকে বাড়ীতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। বাবা এক রকম, দাদা এক রকম, শান্তি বলে একটা জিনিষ বাড়ীতে একেবারে নেই বল্লেই হয়। বাড়ীতে থাকলেই একটা না একটা অশান্তির ভিতর পড়তেই হবে। ওর চেয়ে বিদেশে বিদেশে থাকাই ভালো। আর তাছাড়া আমি যে কাঠের কারবার বিলাসপুরে খুলেছি সেখানে না থাকলেও তো চলে না। অনেক দিন বাড়ী যাইনি, তাই কল্‌কাতায় ফিরছিলুম, ভাবলুম একবার বাড়ী যাবার সময় জগন্নাথ দর্শন করে যাই।"

প্রফুল্লনাথ নীরোদের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা গুলো হা করিয়া গিলিতেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিবার মত কোন কথা খুঁজিয়া পাইলেন না। যে কথাটা জানিবার জন্য তিনি মহা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা যেন তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। তিনি যেমন চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন ঠিক সেই ভাবেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বিন্দুবাসিনী তাঁহার যেন মনের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, নীরোদের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীরোদ, তোমার দাদার বিয়ের কোন খবর পাওনি, কবে দিন স্থির হ'লো। শীঘ্রই হবে বোধ হয় ?"

বিন্দুবাসিনীর কথায় নীরোদের মুখের উপর একটা বিস্মিতির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সে অবাক ভাবে বিন্দুবাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদার বিয়ে সে কি রকম! কই আমি তো তার কোন খবরই পাইনি। তবে আজ বেলা দুটো তিনটের সময় বাবার একখানা টেলিগ্রাম পেলুম তাতে কই বিয়ের কথা-টথা তো কিছু লেখা নেই। বাবা লিখ্‌ছেন, এই টেলিগ্রাফ পাবামাত্র কল্‌কাতায় চলে আস্‌বে। কেন যে এত জরুরী তলব কল্‌কাতায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে না।"

প্রফুল্লনাথ নীরব থাকিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নীরব থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার অজানিত ভাবে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, "তাহ'লে দু' একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তোমার দাদার বিয়ে। তা না হ'লে তোমার বাবা তোমায় টেলিগ্রাম কর্‌বেন কেন ?"

"তা হ'তে পারে!" নীরোদ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বিন্দুবাসিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "তাহ'লে আজকে উঠি মা। বাবার হুকুম, রাত্রের গাড়ীতেই কল্‌কাতায় রওনা হতে হবে। কিন্তু আমার আজ যাওয়া কিছুতেই ঘটে উঠ্‌বে না। কটকে একটু কাজ আছে সেখানে দু' এক দিন দেরী হওয়াই সম্ভব। আজ রাত্রেই এখান থেকে রওনা হবো বটে কিন্তু কল্‌কাতায় পৌঁছুতে দু' এক দিন দেরী হবে।"

বিন্দুবাসিনী মৃদুস্বরে বলিলেন, "এস বাবা, এস। রাত হয়ে গেছে।"

নীরোদ আবার বিন্দুবাসিনীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। তখন আকাশে নক্ষত্র মালা সমুদ্রের নীল জলে হীরার কণ্ঠি পরাইয়া দিয়া রাজ-রাজেশ্বরীর মূর্ত্তিতে তাহাকে সাজাইয়া দিয়া ছিল ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পদ্মকে জল হইতে তুলিয়া যতই কেন যত্নে রাখ না সে যেমন ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া ক্রমে একেবারে বিশুষ্ক হইয়া পড়ে। শোভাও সেইরূপ ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া পড়িতেছিল। সে প্রাণটাকে শত চেষ্টা সত্বেও কিছুতেই চাঙ্গা করিতে পারিতেছিল না। দিন দিন তাহার প্রাণটা যেন কেমন উদাস হইয়া পড়িতেছিল। নারীর সহ্য করাই সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম, প্রফুল্লনাথের শেষ কথাটা সে বার বার মনে করিয়াও প্রাণটাকে কিছুতেই দৃঢ় করিতে পারিতে ছিল না। তাহার সমস্ত দেহটা যেন আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে ছিল। অনেকক্ষণ প্রভাত হইয়াছে। কর্ম্ম কোলাহল মুখরিত কলিকাতা সহর রাত্রের আলস্য ছাড়িয়া আবার কর্ম্ম কোলাহলে অঙ্গ ভাসিয়া দিয়াছে। শোভা তাহাদের ক্ষুদ্র বাড়ীর ক্ষুদ্র বৈঠকখানা ঘরে তক্তপোষের উপর একটা বালিশ মাথায় দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া কড়ি কাঠের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার ম্লান মুখখানি তাহার।।দেহের অনিন্দ্য

সৌন্দর্য্যকে হ্রাস করিতে পারে নাই, মেঘে ঢাকা আকাশের ক্ষীণ চাঁদের আলোর মত তাহা যেন আরও ফুটিয়া পড়িয়াছিল। এতক্ষণ গৃহে কেহ ছিল না, সে একাকী শুইয়া শুইয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিতেছিল। সহসা প্রভার হি হি হাসির শব্দে তাহার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়িল। শোভা তাড়াতাড়ি পাশ ফিরিয়া দ্বারের দিকে চাহিল।

প্রভা হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার দিদিকে ফিরিতে দেখিয়া তাহার হাসির ধূমটা যেন আরোও বাড়িয়া উঠিল। প্রভার হাসিতে শোভা বিরক্ত হইয়া বলিল, "মর, অত হাস্‌ছিস্ কেন? মেয়ের ঢং দেখে আর বাচিনে।"

প্রভা তখন তক্তপোষের একেবারে ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে তাহার দিদির গায়ের উপর হাসিয়া একেবারে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল, "দিদি ভারি মজা হয়েছে, সে একেবারে বেজায় মজা। দিদি তোর বর আবার বদলে গেল। দুর্লভবাবুর বড় ছেলের সঙ্গে তোমার আর বিয়েটি হবে না, সে ভারি মজা! বল দেখি দিদি, তোর কার সঙ্গে বিয়ে হবে? দেখি কেমন বলতে পারিস্?"

প্রভার কথায় শোভা মনে মনে বেশ একটু ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তাই সে প্রভার হাসিতে মহা বিরক্ত

হইয়া বলিল, "মেয়ের রকম দেখে আর বাঁচিনে, হেসে একেবারে কুটি নাটি খাচ্চেন। গা জ্বলে যায়।"

প্রভা সেই ভাবই হাসিতে হাসিতে বলিল, "আর গা জ্বল্লে চলবে না দিদি, আর অমন মুখটি চুপ করে থাকলে হবে না। এবার তোমায় হাসতেই হবে।"

"আমার হাসবার জন্যে বয়ে গেছে।" শোভা মহা বিরক্ত হইয়া যে ভাবে শুইয়াছিল আবার ঠিক সেই ভাবেই শুইয়া পড়িল। প্রভা মুখখানি ভার করিয়া তাহার দিদির হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "কেন হাসবি নে বল না দিদি, তোকে হাসতেই হবে।"

শোভা মহা বিরক্ত স্বরে বলিল, "যা, আমায় বিরক্ত করিস্‌নি বল্‌ছি। আমি সত্যি বাবাকে বলে দেব অমন কল্লে।"

প্রভা মুখখানি ভারি করিয়া বলিল, "তা না শুনলে না শুনলে, আমার বল্‌বার এত কি গরজ? বড্ড মজার কথা তাই বল্‌তে এসেছিলুম।"

প্রভা চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু শোভা ব্যাপারটা কি না জানিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া প্রভাকে ডাকিল, গম্ভীরভাবে বলিল, "চলে যাচ্ছিস্‌ যে কি হয়েছে বললিনি?"

দিদির আহ্বানে প্রভা ফিরিয়া দাঁড়াইল, মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "বা, আমিতো বলতেই এসেছিলুম, তুমিইতো চলে যেতে বল্‌লে। ব্যাপার কি হয়েছে জান দিদি? বিনোদ বাবুর সঙ্গেইতো তোর বিয়ের ঠিক হয়েছিলো সে একটু একটু মদ মদ খায় কি না তাই দুর্লভবাবু তার ওপরে রেগে তার বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। তাই বাবাকে ডেকে বল্লেন, তাঁর ছোট ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।"

শোভা কথাটা অতি আগ্রহের সহিত কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল, কথাটা শেষ হইবামাত্র সে আবার শুইয়া পড়িল। প্রভা, দিদিকে আবার শয্যাগ্রহণ করিতে দেখিয়া মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "দিদি তুই যে আবার শুলি, মুখ যে অমন শুকিয়ে গেল, এ বরও বুঝি তোর পছন্দ হ'লো না?"

শোভা মহা বিরক্ত স্বরে না উঠিয়াই উত্তর দিল, "মেয়ের সব কথায় জ্যাটামি,—গা জ্বলে যায়। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর জ্যাটামি কর্ত্তে হবে না যা।"

প্রভা ঠোট দুইখানি উল্‌টাইয়া চোখটা একটু বড় করিয়া চাহিয়া বলিল, "কি জ্যাটামি কল্লুম?"

শোভা আবার কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, সেই সময় দরজটা দুই হাতে ঠেলিয়া বিশ্বনাথ সেই গৃহের ভিতর

প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "কি জ্যাটামি কল্লুমে আর কাজ নেই। এখন তোদের বাবা কোথায় গেলরে? বাজারে গেছে নাকি?"

দরজা ঠেলার শব্দে শোভা দ্বারের দিকে ফিরিয়াছিল। বিশ্বনাথকে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে তাহার বস্ত্র একটু ভাল করিয়া সংযত করিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না কাকাবাবু, বাবাতো বাজারে যাননি। দুর্লভবাবু তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাই বোধ হয় তিনি সেখানে গিয়েছেন। আপনি একটু বসুন না, বাবা এখুনি আসবেন।"

"দুর্লভ মিত্তির তাহ'লে কাশী থেকে ফিরেছে।" বিশ্বনাথ তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার পর আবার শোভার দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল, "তাহ'লে বিয়ের দিনটা কবে স্থির হ'লো?"

শোভা কোন উত্তর দিল না। লজ্জায় তাহার মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। প্রভা বিশ্বনাথের কোলের নিকট আসিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "দেখনা কাকাবাবু দিদি আমায় আজ কাল শুধু শুধু বকে।"

বিশ্বনাথ মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "তা আজ কাল বকবে না তোর দিদি, সে এখন বড় লোকের বৌ হচ্ছে, 'দু' একটা বকবে

বইকি। দু'দিন বাদে বেটী হয়তো আর আমাদেরই চিন্‌তে পারবে না।"

বিশ্বনাথ আরও কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু হরিচরণকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে নীরব হইল। মাথাটা তুলিয়া হরিচরণের মুখের দিকে চাহিল। সুরায় উন্মত্ত অবস্থায় বিনোদলাল যে দিন হরিচরণের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পর হইতে এই কয়দিন হরিচরণের মুখখানা একেবারেই ম্লান হইয়াছিল। কিন্তু আজ বিশ্বনাথ, হরিচরণ গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র স্পষ্টই লক্ষ্য করিল, একটা আনন্দের দীপ্ত সেই ম্লান মুখখানার উপর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। হরিচরণ আজ যে একটা বিশেষ কোন আনন্দ সংবাদ লইয়া দুর্লভবাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়াছে তাহা বুঝিতে বিশ্বনাথের মোটেই কষ্ট পাইতে হইল না। ব্যাপারটা যে কি জানিবার জন্য বিশ্বনাথ বেশ একটু উদ্‌গ্রীভ হইয়া হরিচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হরিচরণ বৈঠকখানা গৃহে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষের উপর বিশ্বনাথকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপরে বিশ্বনাথ তুমি কতক্ষণ এলে ?"

বিশ্বনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "আমি যতক্ষণই আসি তাতে তো কিছু এসে যাচ্ছে না। তারপর তোমার খবর

কি তাই এখন বল। দুর্লভ মিত্তিরের কাছে তো গেছ্‌লে, মুখখানাও বেশ আনন্দ আনন্দ ঠেক্‌ছে। বিয়ের দিন বুঝি স্থির হয়ে গেল ?"

হরিচরণ তক্তপোষের নিম্ন হইতে একটা কলিকা বাহির করিয়া লইয়া বিশ্বনাথের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। তাহার পর কলিকা হইতে একখানা টিকা তুলিয়া লইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে করিতে বলিলেন, "হ্যাঁ। বিয়ের দিন টিন সব স্থির হয়ে গেল সে কথা সত্য। তারপর তুমি যার জন্যে ভাবছো, তার জন্যে আর ভাবার কিছু নেই। আমি তো তোমায় গোড়া থেকেই বলে আসছি, দুর্লভবাবু বুঝলে একটা মহৎ লোক, তার কাছে অনেহ্য কিছু হবার যোটি নেই। বিনোদ যে মদ খায় তা তিনি খবর পেয়েছেন। তাই তিনি তার সঙ্গে নিজেই শোভার বিয়ে দিতে রাজী নন। তার ছোট ছেলে নীরোদের সঙ্গে শোভার বিয়ে পাকা হ'য়ে গেল। কাল নীরোদ কল্‌কাতায় এসে পৌঁছুবে,—পরশু খুব ভাল লগ্ন, সেই লগ্নেই বিয়ে স্থির হয়ে গেল। নীরোদের সঙ্গে তুমি তো কথাবার্ত্তা কয়ে দেখছ, তার চরিত্রের বিষয় কোন কথা বল্‌বার জোটী নেই।"

বিশ্বনাথ, হরিচরণের মুখের দিকে চাহিয়া কথাটা বেশ হৃদয়াঙ্গম করিয়া শুনিতেছিল; হরিচরণ চুপ করিবা মাত্র সে

বলিয়া উঠিল, "খুব ভালো! ভায়া আমি ঢের ঢের দেখেছি কিন্তু এমনটী কখন দেখিনি। পাত্রীতো একটী কিন্তু পাত্র অনবরতই বদ্‌লাচ্ছে। প্রথম হ'লো বড় ছেলে, তারপর হলেন নিজে। ফের আবার ঘুরে এলো সেই বড় ছেলে, এখন আবার হচ্ছে ছোট ছেলে। এরপর আবার না শুন্‌তে হয়,—না ছোট ছেলের সঙ্গেও তোমার মেয়ের বিয়ে হবে না; আমার যে বিধবা মেয়ে আছে তার সঙ্গেই তোমার মেয়ের বিয়ে দেব। ভায়া বড়লোকের বড় কথা। আমরা গরীব ওর ভেতরে একেবারেই নেই। ও সব বড় বড় কথার মানেও ছাই বুঝিনে কিন্তু এতদিনে বুঝলুম যথার্থই তোমার মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।"

হরিচরণ তখন কলিকাটায় অগ্নি সংযোগ করিয়া হুকার মাথার সেটা বসাইয়া ছিলেন। তিনি হুকাটায় কয়েকটা জোর জোর টান দিয়া সেটা বিশ্বনাথের হস্তে দিয়া বলিলেন,-"বিশ্বনাথ বাঙ্গালীর কন্যাদায় যে কি তাতো কখন জানতে পারলে না। যদি বুঝতে তা হ'লে এমন কথা কখনই বলতে পারতে না! যার কন্যাদায় হয় তার কি কখন মাথার ঠিক থাকতে পারে? তিল দিয়ে পিতৃ-মাতৃ দায় থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে কিন্তু বিনা টাকায় কখন মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। যার টাকা নেই তার কি পাত্রাপাত্র দেখা সাজে না শোভা পায় বিশ্বনাথ!"

হরিচরণের স্বর ক্রমেই গাড় হইয়া আসিল, তাহার প্রাণের বেদনা গলিয়া অশ্রু হইয়া চখের কোণে উছলিয়া উঠিল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিশ্বনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। বিশ্বনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "এহ জন্যই তো আমরা এত উচ্ছন্ন গিয়েছি!" ভায়া এটাতো একবার অন্ততঃ ভাবাও উচিত যে মেয়েদেরও একটা পছন্দ অপছন্দ আছে। এই যে একটার পর একটা বর বদল হচ্ছে, এই যে এত বড় একটা কাণ্ড চলেছে কই এক দিনের জন্যও তো তুমি তোমার মেয়ের প্রাণের কথাটা জানতে কি, একবারও চেষ্টা করেছ? বুড়ো হক্—রুগ্ন হক্—কুরূপ হক তুমি যার হাতে তোমার মেয়েকে তুলে দেবে—তারই গলায় তাকে মালা দিতে হবে। এত বড় অবিচার যে জাতের ভিতর চল্‌ছে তাহাদের কি আর ভদ্রস্থ আছে। শুধু বাঙ্গালী মেয়েদের দীর্ঘ নিশ্বাসে বাঙ্গালাটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাহাদুরী এই যে, আমরা সেই ছাই গায়ে মেখে আবার আনন্দ করি।"

বিশ্বনাথের এই প্রকাণ্ড বক্তিতাটা হরিচরণ কাণ পাতিয়া শুনিতেছিলেন। সে নীরব হইবা মাত্র তিনি ধীরে ধীরে আবার বলিলেন, "বাঙ্গালা দেশের এই হ'লো চিরন্তর প্রথা, এর জন্য তুমি আমি আর দুঃখ করে কি করবো বল! সে কথা

এখন থাক্, অন্ততঃ শোভার মুখ চেয়েও আর খুঁতমুত করে অলক্ষণ ডেকে এনো না। ভগবানের উপর নির্ভর কর। তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন এই ভেবে মনের ভিতরকার কুভাবনা গুলোকে ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার করে ফেল।"

বিশ্বনাথ মাথাটা নাড়িয়া বলিল, "তা ভিন্ন আর উপায় কি বল! তুমি যখন দুর্লভবাবুর ঘরে তোমার মেয়ে না দিয়ে ছাড়বে না—তখন আর খুঁতমুত করে করছি কি বল?"

হরিচরণ কোন উত্তর দিল না। বিশ্বনাথেরও বলিবার মত যাহা কিছু ছিল সমস্তই বলা শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে নীরবে বসিয়া হস্তস্থিত হুকাটায় ধীরে ধীরে টান দিয়া তাম্রকূটের ধূমে ভিতরের কালোটাকে পরিষ্কার করিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নীরোদ চলিয়া গেল। বিন্দুবাসিনী তাহার অস্থির প্রাণটাকে আর কিছুতেই সুস্থির করিতে পারিলেন না। তাহার অশান্ত প্রাণের যাতনাটা কতক পরিমানে লঘু হইবে ভাবিয়াই তিনি তাঁড়াতাড়ি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পুরী চলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু পুরী আসিয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়াও তাঁহার প্রাণের শূন্যতা কিছুতেই আর পূর্ণ হইল না বরং সেটা আরোও যেন মহা শূন্য হইয়া প্রাণের ভিতর দিন রাত্র হাহাকার করিতে লাগিল। নীরোদ চলিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ পুত্র ও জননী সাগরের দিকে চাহিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। উভয়ের প্রাণের ভিতরেই ঝড় বহিতেছিল তবে দুইটা দুই প্রকারের। একজনের ঘূর্ণি বাতাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া একেবারে হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, অপরের দমকা বাতাস কেবল মাত্র স্নেহের বাঁধনে ক্ষণে ক্ষণে আঘাৎ করিতেছিল। বহুক্ষণ কাহার মুখে কথা নাই,—সহসা বিন্দুবাসিনী পুত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "চ, প্রফুল্ল আমরা কালই কল্‌কাতা ফিরে যাই।

সেখানে কে যেন আমায় টান্‌ছে। আর এক তিলও এখানে আমার মন বস্‌ছে না। দিন রাতই প্রাণের ভেতর যেন কেমন হু হু কচ্ছে!"

জননীর কথায় প্রফুল্লনাথ ফিরিলেন, একবার মাত্র চকিতের জন্য উর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহিলেন। রজনীর গাঢ় অন্ধকারে নীল আকাশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহাতে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ জোনাকীর আলোর মত মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে। প্রফুল্ল নাথ অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলেন, "বেশ তো মা, চল কালই ফিরে যাই।"

বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "সেই ভালো, কালই আমরা কল্‌কাতায় ফিরে যাব।"

প্রফুল্লনাথ জননীর কথায় কোন উত্তর দিলেন না। অন্ধকার রাত্রে মহা সিন্ধুর অনন্ত সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া তাহার অফুরান্ত সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। বিন্দুবাসিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন, 'চ' প্রফুল্ল বাড়ীর ভেতর যাই, রাত অনেক হ'লো। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, জলো হাওয়া বেশীক্ষণ গায়ে লাগ্‌লে তোর আবার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

বিন্দুবাসিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে পুত্রের নিকট গিয়া তাহার পৃষ্ঠে হস্ত দিলেন। নীরোদ চলিয়া

যাইবার পর হইতেই প্রফুল্লনাথের প্রাণটা একেবারেই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। জননীর স্পর্শে তিনি চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিন্দুবাসিনী বলিলেন, "চ' ভেতরে যাই, বেশীক্ষণ জলের ধারে বসে থাকা একেবারেই ভালো নয়।"

প্রফুল্লনাথ কোন কথা কহিলেন না, জননীয় পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তখন কাছারির ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া রাত্রির দীর্ঘতা চারিদিকে প্রচারিত করিতেছিল।

* * * * * *

পর দিন প্রত্যুষেই প্রফুল্লনাথ জননীকে লইয়া পুরী পরিত্যাগ করিলেন। পথে সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাঁহারা যখন কলিকাতায়, বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পাড়ায় হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। দুর্লভবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী পত্র, পুষ্প, রেশমী পর্দ্দায় সজ্জিত হইয়াছে। ফটকের উপর নহবৎ বাজিতেছে। তথা হইতে সুলতান, আসওয়ারী প্রভৃতি রাগিণী বিবাহ উৎসব আকাশে বাতাসে ধ্বনিত করিতেছে। দুর্লভবাবু পুত্রের বিবাহে খরচ পত্র রীতিমতই করিতেছিলেন, আয়োজনের বিন্দুমাত্র ত্রুটী রাখেন নাই। গাড়ী বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রফুল্লনাথ ও বিন্দুবাসিনীর কর্ণে নহবতের মধুর

রাগিণী প্রবেশ করিয়াছিল। গাড়ী দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, দুর্লভবাবুর ফটকের উপরে নহবৎ বসিয়াছে। এ নহবৎ কিসের জন্য ও কি উদ্দেশ্যে বাজিতেছে তাহা বুঝিতে মাতা ও পুত্রে আর বাকি রহিল না। এক সঙ্গে উভয়েরই মনে উদয় হইল, 'আরো দিন কয়েক অন্ততঃ পরে তাহাদের কলিকাতায় ফেরা উচিত ছিল।' যাহা উচিত ছিল যখন তাহা হয় নাই তাহার জন্য এক্ষণে বৃথা অনুশোচনা করা একেবারেই অনর্থক। গাড়ী হইতে নামিয়া প্রফুল্লনাথ জননীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রফুল্লনাথের তখন প্রাণটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল;—তিনি প্রাণপণ শক্তিতে সেটা দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রফুল্লনাথদের গাড়ী যখন বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তখন প্রভা তাহাদের ক্ষুদ্র বাড়ীর ক্ষুদ্র রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়াছিল। দিদির বিবাহের আনন্দে সে দিন তাহার ঘুমটা খুব প্রত্যুষেই ভাঙ্গিয়াছিল। প্রফুল্লনাথদের বাড়ীর সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, গাড়ী হইতে কে নামে দেখিবার জন্য সে বেশ একটু উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই দিকে চাহিয়া ছিল। গাড়ী হইতে বিন্দুবাসিনী ও প্রফুল্ল-নাথকে নামিতে দেখিয়া তাহার প্রাণের ভিতর যেন একটা

নূতন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে সেই সংবাদটা তাহার দিদিকে দিবার জন্য ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রভা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া একেবারে তাহাদের শয়ন কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু সেখানে সে তাহার দিদিকে না দেখিয়া মহা ব্যস্তভাবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, উঠান হইতেই "দিদি, দিদি," বলিয়া চীৎকার করিয়া শোভার অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

শোভা শয্যা ত্যাগ করিয়াই ছাদের উপরে যাইয়া উঠিয়াছিল। আজ তাহার বিবাহ। প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত তাহার মুখখানি একেবারে ম্লান হইয়া গিয়াছে;—থাকিয়া থাকিয়া তাহার প্রাণের ভিতরটা গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। তাহার হৃদয়াকাশে একটা কালো মেঘ চারিধার হইতে ঘনাইয়া উঠিয়া তাহার সমস্ত প্রাণটাকে একেবারে গুমোট করিয়া তুলিয়া ছিল। যাতনা বেদনা অনুভব করিবার শক্তি তাঁহার একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার প্রাণের সে আনন্দ, মুখের সে হাসি আর নাই। সে পিতার আদেশে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য প্রাণটাকে একেবারে দৃঢ় করিয়া ফেলিয়া ছিল। সে জানিত নীরবে সহ্য করাই নারীর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম বজায় রাখিতে যদি হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় তবুও তাহাকে সেই ধর্ম্ম মাথায় পাতিয়া

লইতে হইবে। শোভা ছাদের মধ্যস্থলে চুপটী করিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে ছিল। তাহার দৃষ্টি প্রফুল্লনাথের বাড়ীর দিকে সন্নিবদ্ধ। সহসা প্রভার স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করায় তাহার প্রাণটা একেবারে ধড়াস করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া ছাদের আলিসার নিকট আসিয়া প্রভা কি জন্য তাহাকে ডাকিতেছে দেখিবার জন্য আলিসার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। প্রভা উঠানের মাঝখান হইতেই চীৎকার আরম্ভ করিয়া ছিল; তাহার দৃষ্টি উর্দ্ধে। প্রভা আলিসার নিকট আসিবামাত্র সে তাহার দিদিকে দেখিতে পাইল। দিদিকে দেখিবামাত্র সে হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল, "দিদি, প্রফুল্লদাদারা এইমাত্র পুরী থেকে ফিরে এলো।"

সে দিদির নিকট হইতে কোন উত্তর শুনিবার অবসর না দিয়াই একেবারে হাসিতে হাসিতে ছাদের সিঁড়ির দিকে ছুটিল। প্রফুল্লদাদারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে এইটুকু আনন্দ বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরিতে ছিল না। দিদি প্রফুল্লদাদারা ফিরে এলো। এইটুকু মাত্র শোভার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতেই একটা আকুল আগ্রহ তীব্র গতিতে তাহার প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে প্রভার আগমণ অপেক্ষায় ছাদের দরজার দিকে চাহিল। প্রভা হাপাইতে হাপাইতে ছাদে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে আবার

বলিল, "দিদি এইমাত্র প্রফুল্লদাদারা পুরী থেকে ফিরে এলো।"

শোভা তাহার প্রাণের আকুলতা প্রাণের মধ্যে দমন করিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি করে জান্‌লি ?"

প্রভা গালে হাত দিয়া মুখ খানা ভার করিয়া বলিল, "আমি কি করে জান্‌লুম সে কি দিদি! আমি যে এই চোখ দুটিতে দেখে এলুম। বুঝলে দিদি, যেমন রকে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখি প্রফুল্লদা গাড়ী থেকে নাম্‌ছে। যেমন দেখা অমনি আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি।"

প্রভার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া শোভা মৃদু হাসিয়া বলিল, "প্রফুল্লদাদাকে দেখে তুই পালিয়ে এলি কেন ? প্রফুল্লদাদারা পুরী থেকে ফিরে এলো,—যানা দেখা করে আয় না।"

প্রভা ঠোঁট দুইটা উল্‌টাইয়া মাথাটা নীচু করিয়া তাহার দিদির কথায় উত্তর দিল, "না ভাই, আমি যেতে পারবো না: আমার ভারি লজ্জা কচ্ছে!"

"মেয়ের ঢং দেখে আর বাঁচিনে!" শোভা আর দাঁড়াইল না, ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। ছাদ হইতে নিচে নামিবা মাত্র পিতার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। হরিচরণ কন্যাদ্বয়কে ছাদ হইতে নামিতে দেখিয়া গাঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত সকালে ছাদে তোরা কি কচ্ছিলি মা ?"

শোভা উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রভা তাড়াতাড়ি বলিল, "বাবা, প্রফুল্লদাদারা এই মাত্র পুরী থেকে ফিরে এলো।"

প্রভার কথায় হরিচরণ বিস্মিত ভাবে কন্যাদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিল। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রফুল্লরা ফিরে এসেছে! কখন,—কই আমি তো কিছু জান্‌তে পারিনে!"

প্রভা তাহার পিতার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "তুমি কি করে জান্‌তে পারবে বাবা! আমি দেখলুম যে এই মাত্র প্রফুল্লদাদারা গাড়ী থেকে নামলো।"

হরিচরণ কন্যার কথায় বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "বেশ ভালই হয়েছে। প্রভা, তোর প্রফুল্লদাদার সঙ্গে দেখা ক'রে আসিগে চ'। আর আজ শোভার বিয়ের খবরটাও বৌঠান্‌কে জানিয়ে আসিগে।"

হরিচরণ কনিষ্ঠ কন্যার হস্ত ধরিয়া প্রফুল্লনাথদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

পুরী হইতে নীরোদ যে রাত্রে কটক রওনা হইয়াছিল, সেই রাত্রেই সে তাহার পিতাকে একখানি টেলিগ্রাম করিয়াছিল যে তাহার কটকে একটু বিশেষ কাজ থাকায় আজ রাত্রেই তাহাকে কটকে রওনা হইতে হইতেছে, সেখানে তাহার সম্ভবত দুই তিন দিন বিলম্ব হইতে পারে। তথা হইতে সে যত শীঘ্র সম্ভব কলিকাতায় যাত্রা করিবে। কিন্তু কটকে পৌঁছিয়াই সে আবার দুর্লভবাবুর টেলিগ্রাম পাইল,—"যতই জরুরী কাজ থাক সমস্ত বন্ধ রাখিয়া তুমি অবিলম্বে কলিকাতা রওনা হইবে। না আসিলে সমূহ ক্ষতি জানিবে। তুমি এই টেলিগ্রাম পাইবামাত্র তোমার রওনা সংবাদ টেলিগ্রামে জানাইবে।"

পিতার এরূপ টেলিগ্রাম পাইবার পর নীরোদ আর কটকে অপেক্ষা করিতে পারিল না। সে তৎক্ষণাৎ তাহার পিতাকে টেলিগ্রাম করিল, "আমি কল্যই ম্যাড্রাস্ মেলে কলিকাতায় রওনা হইব। পরশু বেলা দশটার পর আমি নিশ্চয়ই বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইব।"

যে কাজের জন্য নীরোদ কটকে আসিয়াছিল তাহা আর তাহার সারা হইল না। সে সেইদিন রাত্রেই ম্যাড্রাস্ মেলে কলিকতা রওনা হইল। ম্যাড্রাস্ মেল যখন হাওড়ার ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন বেলা সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছে। তথাপি কেরানীকুলের ভীড় হাওড়ার পুলের উপর কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই। ট্রেন হইতে নামিয়া কেরানী কুল যে যাহার অফিসের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। দুর্লভ বাবু নীরোদের টেলিগ্রাম যথা সময়ে পাইয়া ছিলেন। তিনি নীরোদকে আনিবার জন্য তাঁহার বাড়ীর গাড়ী ট্রেন পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হাওড়া ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। নীরোদ প্লাটফরম হইতে বাহির হইবা মাত্র সহিস্ তাঁহাকে সেলাম করিল। তিনি সে দিকে লক্ষ্য না করিয়াই সহিসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। মাল পত্র গাড়ীর ছাদে বোঝাই হইবার পর গাড়ী তাহাকে লইয়া তাহাদের বাড়ীর পথে রওনা হইল। নীরোদ নীরবে বসিয়া পিতা তাহাকে এরূপ উপর্য্যুপরি কলিকাতায় আসিবার জন্য টেলিগ্রাম করিতে ছিলেন কেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

যে দিন প্রত্যূষে প্রফুল্লনাথ তাহার মাতাকে লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই দিনই নীরোদও

ম্যাড রাস্ মেলে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইবা মাত্র সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। ফটকের উপর নহবৎ বাজিতেছে, ভিতরে মহাসমারহ ব্যাপার চলিতেছে। বাড়ীর মূর্ত্তি দেখিয়া নীরোদ বুঝিল বাড়ীতে একটা বিবাহের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। সে নিজে কোন সংবাদ না রাখিলেও, পুরীতে বিন্দুবাসিনীর মুখে যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে সে এইটুকু বুঝিয়াছিল যে, তাহার দাদার বিবাহ নিকটবর্ত্তি। গাড়ী ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইবা মাত্র সে তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। ফটকের সম্মুখে কয়েকজন ভৃত্য ও দরওয়ান বসিয়া গল্প করিতে ছিল,—ছোট বাবুকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে সেলাম করিল। নীরোদ সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

নীরোদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে সংবাদ পাইবা মাত্র দুর্লভ-বাবু বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নীরোদ উপরে উঠিয়া মস্তক অবনত কয়িয়া পিতার চরণ ধুলি গ্রহণ করিল। দুর্লভবাবু তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "এস ভেতরে এস, আমার টেলিগ্রাম ঠিক সময়েই পেয়েছিলে তা হলে?"

নীরোদ অবনত মস্তকে কেবল মাত্র উত্তর দিল, "আজ্ঞা হাঁ।"

দুর্লভবাবু পুত্রকে আর বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। "উমা নীরোদ এসে পৌঁছুছে," বলিতে বলিতে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

উমা ভাড়ার ঘরের ভিতর বসিয়া বিবাহের জিনিষ পত্র গুছাইতেছিল। পিতার স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। উমাকে ভাড়ার ঘর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া দুর্লভবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা তো সবাই ভেবেই অস্থির হয়ে ছিলে যে, নীরোদ এসে ঠিক সময় কিছুতেই পৌঁছুতে পারবে না কিন্তু আমি ঠিক জান্‌তুম সে নিশ্চয়ই পৌঁছুবে ;—সে বিশ্বাস না থাক্‌লে কি এত বড় একটা কাজে হাত দিতে পারি !"

পিতার কথায় নীরোদ বেশ একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। উমা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে মহা আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "দাদার বিয়ে আজই নাকি?"

দুর্লভবাবুর মুখখানা ভয়াবহ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। তিনি কন্যার দিকে ফিরিয়াছিলেন, পুত্রের দিকে ফিরিয়া বেশ একটু গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার দাদার কথা আর মুখে এনো না, আমি তাকে তেজ্য পুত্র করেছি। সে একেবারে দুর্দ্দান্ত মাতাল হয়ে গেছে। তার সঙ্গে কোন ভদ্রলোকের

মেয়ের বিয়ে দেওয়া একেবারে অসম্ভব। তাই আমি তাকে বাড়ী থেকে দূর করে দিয়ে হরিচরণের বড় মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে স্থির করেছি। বিয়ে তোমার,—তোমার দাদাব নয়। আর সে বিয়ে এই রাত্রেই।"

পিতার কথা শুনিয়া নীরোদ একেবারে স্তম্ভিত হইযা গিয়াছিল। বিস্ময়ে তাহার মুখ হইতে কথা বাহিব হইতেছিল না। সে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া অতি কষ্টে বিস্মিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমার বিযে! সে কি রকম? কই আমিতো তার বিন্দু বিসর্গও জানি না। তা কি করে হতে পারে। এও কি কখন সম্ভব?"

দুর্লভবাবু মহা ব্যস্তভাবে পুত্রের কথার মাঝখানেই বাধা দিলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটা গম্ভীর স্বর বাহিব হইল, "সম্ভব নয় কিসে? এখন কি আর সম্ভব নয় বল্লে চলে। সব ঠিকঠাক,—আজ রাত্রে বিয়ে এখন আর কি না টা চলে। আমি তোমার বাবা, আমি যখন কথা দিয়েছি তখন কি আর তোমার না বলা সাজে! গরীব, বৃদ্ধ, কন্যদায়গ্রস্থ,—তাকে কোন হিসাবে বিপদে ফেল্‌তে চাইচো। মেয়ে সুন্দরী, আমি দেখে শুনে পাত্রী স্থির করেছি এতে তোমার না বল্‌বার আমি কোন কারণই দেখতে পাইনি।"

পিতার কথায় নীরোদের মুখখানা যেন একটা চিন্তার কালো

মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিল ;—পিতা নীরব হইবা মাত্র সে ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "আপনি নিশ্চয়ই রাগ কর্ব্বেন কিন্তু কি কর্ব্বো এ বিয়ে কর্ত্তে আমি কিছুতেই সম্মত হতে পারি না। সম্মত না হ'বার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। দাদা আপনার ছেলে, আপনার কাছে মহা অপরাধী হতে পারেন কিন্তু তবুও তিনি যে আমার দাদা। দাদার ন্যায় অন্যায় দেখ্‌বার ছোট ভায়ের কোন অধিকার নেই। দাদার সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা হয়েছিলো, দাদা যাকে বিয়ে কর্ব্বেন মনে করেছিলেন সে তো আমার বৌদিদি। আমি তাকে কোন হিসেবেই বিয়ে কর্ত্তে পারিনে। আপনার কথায় আমি হরিচরণবাবুর ছোট মেয়েকে অনায়াসে বিয়ে কর্ত্তে পারি কিন্তু বড় মেয়েকে কোন হিসাবে বিয়ে কর্ব্বো বলুন? আপনি বরং সেই বন্দোবস্ত করুণ আমি তাতে রাজি আছি।"

যাহা কিছু বলিবার ছিল সমস্ত এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া নীরোদ নীরব হইল। দুর্ল্লভবাবু তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের স্বভাব বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছিলেন, সে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের ন্যায় দুর্ব্বল হৃদয় নহে। সে একবার যাহা ন্যায্য বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া লয় তাহা হইতে তাহাকে টলান দুস্কর। সে অপরের উপরোধ অনুরোধ কখন

কোন দিনও গ্রাহ্যের ভিতরেই আনিত না। পুত্রের কথায় সমস্ত পৃথিবীটা যেন দুর্লভবাবুর চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! বিবাহের সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে, গায়ে হলুদ পাঠাইবারও আর বিলম্ব নাই, এক্ষণে পুত্রের মুখে একি কথা! দুর্লভবাবু এরূপ বিপদে পূর্ব্বে আর কখন পতিত হন নাই। বিবাহের আনন্দ উৎসব তাঁহার কর্ণের চারিপার্শ্বে যেন একটা বিকট হাহাকার তুলিয়া দিল। তাঁহার প্রাণের ভিতর একটা ভয়াবহ ক্রোধ আগ্নেয় গিরির খাত্র প্রসবণের মত ছুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছিল। তিনি প্রাণপণ শক্তিতে সেটাকে প্রাণের ভিতর দমন করিয়া নিজেকে যতদুর সম্ভব সংযত করিয়া ফেলিলেন। পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "তা কি কখন হয়! বড় মেয়ের বিয়ে না হ'লে কখন কি ছোটো মেয়ের বিয়ে হতে পারে? যদি সম্ভব হ'তো তাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু যখন তা সম্ভব নয় তখন অন্ততঃ তোমার বাপের মর্য্যাদা রাখবার জন্যেও তোমাকে হরিচরণের বড় মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে হবে। সব দিক বুঝে দেখ, যদি তুমি তাকে এখন বিয়ে না কর তাহ'লে আমার সমস্ত মান মর্য্যাদা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। তুমি কি তোমার বাপকে দশ-জনের সুম্মুখে অপমানিত কর্ত্তে চাও?"

নীরোদ অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিল, মাথা তুলিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "এতে যদি আপনি অপমানিত হন তাতে আমি কি কর্ত্তে পারি বলুন! যার সঙ্গে আমার মায়ের মত বড় বৌদিদি সম্পর্ক হচ্ছিলো তাকে আমি কেমন করে বিয়ে করি? আর আপনিই বা কেমন করে তাকে আমায় বিয়ে কর্ত্তে অনুরোধ করেন?"

যে ক্রোধকে দুর্ল্লভবাবু কণ্ঠের ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, পুত্রের কথায় তাহা আর কিছুতেই কণ্ঠের ভিতর আবদ্ধ রহিল না। তিনি রক্তবর্ণ চক্ষে পুত্রের দিকে চাহিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "আমি তোমার কোন বক্তিতা শুনতে চাইনি। তুমি হরিচরণের বড় মেয়েকে বিয়ে কর্ব্বে কি না শুধু তার স্পষ্ট জবাব দাও।"

অবিচলিত কণ্ঠে নীরোদ উত্তর দিল, "যা হয় না তা চির-দিনই হবে না। আমি হরিচরণবাবুর বড় মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে কর্ত্তে পারিনে।"

ক্রোধে দুর্ল্লভবাবুর দেহটা একেবারে স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "যাও এখনি আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যাও—"

এ পর্য্যন্ত উমা একটীও কথা কহে নাই নীরবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে যখন দেখিল তাহার পিতার ক্রোধে সমস্ত পণ্ড

হইয়া যায় তখন আর চুপ করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিল না ;—ধীরে ধীরে কম্পিত স্বরে ডাকিল "বাবা—"

দুর্লভবাবু ক্রোধে তখন জ্ঞান হারাইয়াছিলেন,—তিনি কন্যার আহ্বানে বাধা দিয়া অতি তীব্র স্বরে বলিলেন, "না আমি কারুর কোন কথা শুন্‌তে চাইনি। আজ থেকে আমি নিঃসন্তান।"

দুর্লভবাবু গলার পর্দ্দাটা যতদুর সম্ভব উচ্চে তুলিয়া গৃহের দ্বারের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন, "গোবর্দ্ধন।"

সে স্বর গোবর্দ্ধনের কর্ণে পৌঁছিবা মাত্র, সে মহা ব্যস্ত হইঁয়া ছুটিয়া উপরে আসিল। গোবর্দ্ধন গৃহের মধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র, দুর্লভবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "যা এখনি সরকার মশাইকে আমার সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তে বল্।"

গোবর্দ্ধন যেরূপ ছুটিয়া উপরে আসিয়াছিল আবার ঠিক সেইরূপ ছুটিয়াই নিম্নে নামিয়া গেল। দুর্লভবাবু পুত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"যাও আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক্‌বার আর কোন প্রয়োজন নেই। যে ছেলে বাপের একটা অনুরোধ রাখতে পারে না তেমন ছেলের থাকার চেয়ে না থাকাই মঙ্গল।"

পিতার কথার প্রতিবাদে নীরোদ একটীও কথা কহিল না। সে নীরবে অবনত মস্তকে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

গোবৰ্দ্ধনের নিকট বাবুর জরুরী তলব পাইয়া বৃদ্ধ সরকার সমস্ত কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া ছুটিয়া উপরে আসিল। সে গোবর্দ্ধনের নিকটেই বাবুর মেজাজের কতকটা আভাস পাইয়াছিল ;—কম্পিত হৃদয়ে ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল। সরকার মহাশয়কে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া দুর্ল্লভ-বাবু গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড়বাবু কোথায়,—তার কোন খবর রাখ ?"

সরকার মহাশয় দুই হস্ত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে উত্তর দিল, "আজ্ঞে তিনি তো সে কথা কিছু যাবার সময় বলে যাননি। তিনি কেবল বলে গেলেন, বাবাকে বলো, নীরোদের যেন বিয়ে দেন। যত দিন পর্য্যন্ত না আমি নিজেকে সংযত কর্ত্তে পারি ততদিন আর আমি বাড়ী ফিরবো না।"

দুর্ল্লভবাবু কেবল মাত্র বলিলেন, "খুব ভাল।"

তাহার পর তিনি সেই গৃহের ভিতর নীরবে কয়েকবার পায়চারি করিয়া বৃদ্ধ সরকারের দিকে ফিরিয়া সহসা বলিলেন, "যাও, এখনি হরিচরণবাবুকে ডেকে নিয়ে এস। বল এখনি একবার বাবুর সঙ্গে দেখা করা চাই ;—বিশেষ জরুরী কাজ।"

সরকার মহাশয় আর দুর্ল্লভ বাবুর মুখের দিকেও চাহিতে সাহস করিল না। সে বিনা বাক্য ব্যয়ে হরিচরণকে

ডাকিতে চলিয়া গেল। সরকার মহাশয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর দুর্লভবাবু ক্রুদ্ধ সিংহের মত গৃহের ভিতর কয়েকবার টল দিয়া বৈঠকখানার দিকে চলিয়া গেলেন। উমা এতক্ষণ নীরবে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়াছিল। ভ্রাতাদিগের আচরণের কথা স্মরণ করিয়া,—অপমানিত পিতার প্রাণের যাতনা ভাবিয়া তাহার নয়নে অশ্রু উছলিয়া উঠিল। সে অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিল।

দুর্লভবাবু যখন বৈঠকখানায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন তখন বৈঠকখানায় কেহ ছিল না। তিনি ধীরে ধীরে বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার পর একটা তাকিয়া টানিয়া তাহাতে ঠেস দিয়া অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় উপবিষ্ট হইলেন। তখন তাহার প্রাণের ভিতর তুমুল ঝটিকা বহিতে ছিল। বাবুকে বৈঠকখানা গৃহে ফরাসের উপর উপবিষ্ট হইতে দেখিয়া গোবর্দ্ধন তাড়াতাড়ি একটা প্রকাণ্ড কলিকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া, সটকার উপর বসাইয়া দিয়া গেল। দুর্লভবাবু সটকার নলটা তুলিয়া লইলেন। তিনি গম্ভীর ভাবে বসিয়া সটকার নলটায় টান দিতে লাগিলেন ও মনে মনে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য তাহাই স্থির করিতে লাগিলেন।

হরিচরণ বৈঠকখানার ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি দুর্লভবাবুর মুখের উপরে পড়িবা মাত্র তাঁহার প্রাণটা একেবারে

কাঁপিয়া উঠিল। দুর্লভ মিত্তিরের মুখের ভাবটা তাঁহার যেন আজ কেমন ভাল ঠেকিল না। তিনি কম্পিত হৃদয়ে ফরাসের এক পার্শ্বে বসিতে বসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমায় ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন?"

"হুঁ"! দুর্লভ বাবু নীরব হইলেন। হরিচরণকে কি বলা উচিত কি বলা উচিত নয় বোধ হয়, তিনি তাহা তখন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেবল একটা নিরাশার দৃষ্টি লইয়া হরিচরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দুর্লভবাবুর ভাবে হরিচরণের প্রাণের আনন্দ একেবারে প্রাণের মধ্যে বসিয়া গেল। তাঁহার মুখ চোখ একেবারে ম্লান হইয়া পড়িল। তিনিও আর সাহস করিয়া দুর্লভবাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। দুর্লভবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, "হরিচরণ, আমার ছোট ছেলে তোমার বড় মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে একেবারেই রাজি নয়। তুমি অন্য পাত্র দেখ।"

অন্য পাত্র দেখ! হরিচরণের মাথার উপর যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি দুর্লভবাবুর কথার অর্থ ভাল হৃদয়াঙ্গম করিতে পারিলেন না;—দুর্লভবাবুর মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিলেন। দুর্লভ বাবু সটকার নলটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন, "অবাধ্য ছেলে, আমি কি কর্ত্তে পারি

ব'ল,—আমার কোন অপরাধ নেই। যত টাকা লাগে, টাকার জন্য চিন্তা করো না, যেমন করে পারো তোমার মেয়ের একটা পাত্র ঠিক ক'রে ফেল,—আজ রাত্রেই বিয়ে হওয়া চাই।"

জগতের সমস্ত আলো হরিচরণের চক্ষের সম্মুখে যেন একেবারে নিবিয়া গেল। পাত্র চাই বলিলেই যদি পাত্র মিলিত তাহা হইলে আর চিন্তার কারণ কি? এখন আর বিন্দুবাসিনীর নিকটে যাইবারও তাঁহার মুখ নাই। চারিদিকেই একটা বিকট নিরাশা যেন দানবের মত দন্ত বিকশিত করিয়া হরিচরণকে বিদ্রুপ করিতে লাগিল, তাঁহার কণ্ঠ হইতে অতি ক্ষীণ স্বরে বাহির হইল, "আমি আর পাত্র স্থির করবো ছাই;—এখন কি আর পাত্র পাওয়া যাবে?"

"পাত্র পাওয়া যাবে না! পাত্র পাওয়া চাই। আজ রাত্রেই তোমার মেয়ের বিয়ে হওয়া চাই। যে কোন উপায়ে হক্।" দুর্লভবাবু দাঁড়াইয়া উঠিলেন, গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দুর্লভ মিত্তির যখন কথা দিয়েছে তোমার বড় মেয়ের বিয়ে দেবে, তখন যেমন ক'রে হক্ এই রাত্রেই তার বিয়ে দেবে। যাও আমি এখনি পাত্রের অনুসন্ধানে বেরুবো।"

"হায় ভগবান, আমার এ কি সর্ব্বনাশ কল্লে।" হরিচরণ নড়িল না,—সে সেইখানেই মাথায় হাত দিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

গোবর্দ্ধন বাবুর আদেশের অপেক্ষায় বৈঠকখানা গৃহের দরজার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। দুর্লভবাবু দরজার দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া "হাকিলেন, "গোবর্দ্ধন"।

"আজ্ঞে," বলিয়া গোবর্দ্ধন দরজার পাশ হইতে মুখ বাহির করিল। দুর্লভবাবু বলিলেন, "যা কোচমানকে এখনি গাড়ী জুতে আনতে বল।"

গোবর্দ্ধন চলিয়া গেল, দুর্লভবাবু ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

গোধূলী ও সন্ধ্যারাণীর লুকোচুরি খেলা বহুক্ষণ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা-বধূ তাঁহার সুচিক্কন কৃষ্ণবসনে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া গোধূলীর আহ্বানে ধীরে ধীরে ধরার কোলে নামিয়া আসিতেছিলেন। গোধূলীর পাংশুবর্ণ মূর্ত্তির ভিতর দিয়া সন্ধ্যার মলিন ছায়া ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—আকাশে তখন চাঁদ উঠে নাই। অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী, সপ্তর্ষি, কালপুরুষ একে একে আসিয়া যে যাহার স্থান অধিকার করিতেছিল। শীতল সান্ধ্য-সমীরণ মাঝে মাঝে ঝির ঝির করিয়া যেমন ইচ্ছা ঘুরিয়া ফিরিয়া বহিয়া যাইতেছিল। প্রফুল্লনাথ গবাক্ষের সম্মুখে একখানা গদি আটা কৌচের উপর, বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়াছিলেন। পুত্রের নিকট হইতে একটু দূরে,—পুত্রের আসন হইতে নিজেকে বেশ একটু পৃথক রাখিয়া বিন্দুবাসিনী বহুক্ষণ হইতেই নীরবে বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় তাঁহার সমস্ত মুখখানা একেবারে অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রফুল্লনাথের প্রাণের ভিতর তখন চিন্তার একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সাগরের তরঙ্গের মত ক্রমেই উত্তাল হইয়া উঠিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, সামান্য একটা বিপ্লবে তাঁহার প্রাণটা একেবারে এমন ধারা মহাশূন্য হইল কেমন করিয়া। এই আকাশভরা অন্ধকার দিয়াও তাহা আর মুছিয়া ফেলিবার কোনই উপায় নাই। এই অবক্ত ক্ষতদাহ,—এইপ্রাণভরা মর্ম্ম-বেদনা হইতে তিনি কি আর কোন দিনও নিজেকে মুক্ত করিতে পারি.েন। গ্রীষ্মের শস্যশূন্য দিগন্ত প্রসারিত মাঠের মত তাঁহার সমস্ত হৃদয়টা একেবারে ধূ, ধূ, করিতেছিল। হায়! আর কি তিনি তাঁহার পূর্ব্বের শান্তি ফিরিয়া পাইবেন? আসে পাশে চারিদিকে তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, কেবল শূন্যতা ও দারিদ্রতা। আশার এটুকুও বাতাস কোথাও বহিতেছে না। জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন ও মলিন নিরাশা চারিদিক হইতে তাহাকে যেন একেবারে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। সেই শূন্য হৃদয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রফুল্লনাথের কাণের মধ্যে,—বুকের মধ্যে,—মস্তিকের মধ্যে,—তাহার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত প্রবাহের মধ্যে,—তাঁহার সমস্ত সংসারে,—তাঁহার আকাশের নক্ষত্রে,—তাঁহার সেই প্রাচীর বেষ্টিত নিভৃত গৃহে একটা গভীর ব্যাকুলতার সহিত যেন বিসর্জ্জনের বাদ্য বাজিতেছিল। সেই বিসর্জ্জনের বাদ্যের ভিতর হইতে একটা গভীর চিন্তা উত্থিত হইয়া প্রফুল্লনাথের চৈতন্যটুকু

পর্য্যন্ত লুপ্ত করিয়াছিল। বিন্দুবাসিনীরও প্রাণের ভিতর চিন্তার শত তরঙ্গ বহিতেছিল। তিনি পুত্রের সহিত আর কি কথা কহিবেন তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তাহার বলিবার যত যাহা কিছু ছিল সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই তাঁহাকেও পুত্রের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

সহসা তথায় ভৃত্য আসিয়া তাহাদের সমস্ত চিন্তাটা যেন একেবারে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। সে ছুটিয়া উপরে আসিয়াছিল;—হাপাইতে হাপাইতে বলিল, "বাবু, দুল ভবাবু এসেছেন।"

দুর্লভবাবু আসিয়াছেন! যে দুর্লভবাবু তাঁহাদের চির শত্রু,—যে দুর্লভ মিত্তির জীবনে কখন তাহাদের বাড়ীতে পদার্পণ করেন নাই.—ঘণ্টা কয়েক পরেই যাঁহার পুত্রের বিবাহ তিনি কি নিমিত্ত সহসা তাঁহাদের বাড়ী উপস্থিত হইয়াছেন! মাতা ও পুত্র কেহই তাহার কোনই মীমাংসা করিতে পারিলেন না। বিন্দুবাসিনী ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন দুর্লভবাবু? আমাদের পাড়ার এই দুর্লভ মিত্তির? হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে কেন,—কিছু বল্লেন কি?"

ভৃত্য বিন্দুবাসিনীর প্রশ্নের আবার কি একটা উত্তর

দিতে যাইতেছিল। সেই সময় দুর্লভবাবু মহা ব্যস্ত ভাবে সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার পশ্চাতে হরিচরণ ও শোভা। ভৃত্যের কণ্ঠের স্বর কণ্ঠেই রহিয়া গেল,—তাহা আর বাহিরে আসিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইল না। তাহার সংবাদ দেওয়া শেষ হইতে না হইতেই দুর্লভবাবুকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে বিস্ময়ে একেবারে অবাক হইয়া গেল।

দুর্লভবাবু, হরিচরণ ও শোভাকে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিন্দুবাসিনী ও প্রফুল্লনাথ উভয়েই বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দরজার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহাদের বিস্ময়ের ধমকটা এত অধিক পরিমাণে উর্দ্ধে উঠিয়াছিল, যে তাহাদের মুখ হইতে কাহারও বাক্য ফুটিল না। দুর্লভবাবু একটু তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রথমেই কথা কহিলেন, "প্রফুল্লনাথ আমার সঙ্গে তোমার বাবার চিরকালই বিবাদ চলে আস্‌ছিলো। আজ এমন ভাবে আমাকে তোমাদের বাড়ী আস্‌তে দেখে, তোমরা নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে পড়েছ,—আশ্চর্য্য হবার কথাও বটে। কিন্তু অন্য উপায় নেই, আজ আমি মহা বিপদগ্রস্ত হয়ে তোমার মায়ের কাছে সামান্য একটু সাহার্য্য নিতে এসেছি। তোমার বাপ অঘোর বোসের কাছে বিপদে পড়ে যে এসেছে,—শত ক্ষতি সহ্য করেও,—শত অপমানিত হয়েও সে তাকে সাহার্য্য কর্ত্তে কুণ্ঠিত হয়নি।

তোমার মা তারই স্ত্রী,—বিপদে পড়ে দুর্লভ মিত্তির আজ তাঁর সাহার্য্য নিতে এসেছে, নিশ্চয়ই সাহায্য পাবে।”

প্রথম বিস্ময়ের ধমকটা কাটিয়া যাইবামাত্র বিন্দুবাসিনী তাড়াতাড়ি তাঁহার সংযত বস্ত্র আবার উত্তমরূপে সংযত করিয়া মস্তকের উপর ঘোমটাটা টানিয়া দিয়াছিলেন। দুর্লভবাবু নীরব হইবামাত্র তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিন্দুবাসিনীকে উঠিতে দেখিয়া দুর্লভবাবু আবার আরম্ভ করিলেন, “তুমি অঘোর বোসের স্ত্রী,—আমি তোমাদের হাজার শত্রু হ'লেও, যখন মাথা হেট ক'রে তোমার দ্বারস্থ হয়েছি, তখন এ ভরশা আছে নিশ্চয়ই সাহার্য্য পাবো।”

প্রফুল্লনাথ বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। শোভা আসিয়া সসঙ্কোচে জড়সড় হইয়া গৃহের দরজার পার্শ্বটীতে দাঁড়াইয়াছে, তাহার দৃষ্টি চকিতের জন্য একবার তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। সেই হইতে তাঁহার মাথাটা যেন কেমন আপনা হইতেই মাটীর সহিত মিশিতে চাহিতেছিল। এতক্ষণে তিনি প্রাণপণ শক্তিতে সমস্ত সঙ্কোচ প্রাণ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাড়াতাড়ি একখানা কেদারা টানিয়া আনিলেন। সেখানাকে দুর্লভবাবুর দিকে একটুখানি আগাইয়া দিয়া, অবনত মস্তকে বলিলেন, “বসুন! আপনি আমাদের বাড়ী এসেছেন এটা আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নয়।”

তাহার পর হরিচরণের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি আবার বলিলেন, "কাকাবাবু আপনিই বা অমন ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন,—আমরা কি আপনার পর ?"

হরিচরণ কথা কহিলেন না,—তাঁহার কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। দুর্লভবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শোভাকে বিবাহ করিবে না, এ সংবাদটা পাইবার পর হইতেই তাঁহার দুই নয়নের অশ্রু মুহূর্ত্তের জন্যও বিশুষ্ক হয় নাই। তাঁহার ভিতর-কার সমস্ত তেজ নিরাশার পীড়নে একেবারে যেন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। কি হইতেছে,—কি না হইতেছে, তাহার কিছুই তাঁহার বুঝিবার শক্তি ছিল না। দুর্লভবাবু একরূপ জোর করিয়া টানিয়া তাঁহাকে প্রফুল্লনাথদিগের বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। প্রফুল্লনাথের স্বরও বোধ হয় হরিচরণের কর্ণে প্রবেশ করিল না,—তিনি যেভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন ঠিক সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি কেবল একবার মাত্র প্রফুল্লনাথের উপর পতিত হইল। সে দৃষ্টিতে শত মিনতি,—শত কাতরতা একেবারে পরিস্ফুট হইয়া পড়িল। প্রফুল্লনাথ সে দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে কিছুতেই খাড়া রাখিতে পারিলেন না ;—মস্তক আপনা হইতেই নত হইয়া পড়িল। দুর্লভবাবু কেদারাখানায় তখনও উপবিষ্ট হন নাই। তিনি সেই কেদারাখানার দিকে কয়েকপদ অগ্রসর হইলেন মাত্র ;—

তাঁহার কণ্ঠ হইতে আবার একটা গম্ভীর স্বর বাহির হইল, "ছেলে বাপের মর্য্যাদা রক্ষা করেনি,—তোমরা আমার প্রতিবেশী, জানিনা তোমরাও আমার মর্য্যাদা রাখবে কি না? হরিচরণ আমার কথার ওপর নির্ভর করে তার মেয়ের বিয়ের কোন চেষ্টাই করেনি,—আর চেষ্টা করবারও বিশেষ কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আজ আমার ছেলে অনুগ্রহ করে বল্লেন তিনি হরিচরণের মেয়েকে বিয়ে কর্ত্তে রাজি নন্। যদি অন্য উপায় হ'তো তাহ'লে আমি তোমাদের বিরক্ত কর্ত্তে আসতুম না। কিন্তু সমস্ত দিন চেষ্টা করেও সুপাত্র তো দূরের কথা একটী পাত্র পর্য্যন্ত যোগাড় কর্ত্তে পারিনি। প্রফুল্লনাথ তুমি আমার ছেলেদের মত কাট-গোঁয়ার নও;—তুমি আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর;—তোমরা আর আমায় নিরাশ করোনা।"

তাহার পর দুর্লভবাবু বিন্দুবাসিনীর দিকে ফিরিয়া আবার বলিলেন, "তুমি অঘোর বোসের স্ত্রী। অঘোর বোস আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিল। পাড়া হিসেবে তুমি মা আমার ছোট ভায়ের স্ত্রী। ভাসুরের মর্য্যাদা রাখা কি তোমার মা উচিত নয়? আর যদি আমায় তোমার স্বামীর চিরশত্রু ভেবে আমার এ অনুরোধ রাখা উচিত নয় মনে করো তাহ'লে অন্ততঃ হরিচরণের মুখ চেয়ে আমার উপর কৃপা করো।"

জানিনা তোমরাও আমার মর্য্যাদা রাখবে কি না ?

দুর্লভবাবুর কথায় প্রফুল্লনাথের বুকের রক্ত একেবারে লাফাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি অজানিত ভাবে একবার মাত্র শোভার উপর পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে হইল,— শোভা যেন আকুল আগ্রহে তাহার বক্ষে একটু আশ্রয় পাইবার জন্য কাতরে ভিক্ষা চাহিতেছে। সেই সঙ্কিত লজ্জিত শোভার ম্লান মুখখানিতে আজ প্রফুল্লনাথ এক নূতন সৌন্দয্য দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল,—সৌন্দর্য্যে সে মুখখানি কি নিঃখুঁত। প্রাণের প্রতিবিম্ব তাহার সেই আননের কোমলতার মধ্যে কি সুকুমার ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। মেঘে ঢাকা চাঁদের মত একটা ক্ষীণ মলিন হাসিতে তাহার অন্তঃকরণ কি আশ্চর্য্য আলোর মত ফুটিয়া পড়িয়াছে। ললাটে সে কি এক অপূর্ব্ব বুদ্ধি,—ঘন পল্লবের ছায়াতলে দুই চক্ষুর মধ্যে কি নিবিড় অনির্ব্বচনীয়তা! সুকোমল বাহু দুইটা যেন সেবা ও সৌন্দর্য্যকে সার্থক করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। প্রফুল্লনাথ তাঁহার জীবনকে,—যৌবনকে ধন্য জ্ঞান করিলেন! তাঁহার মাথাটা যেন একেবারে ঘুরিয়া উঠিল,—তিনি আর একটু হইলেই ভূপতিত হইতেন, কিন্তু তাড়াতাড়ি পার্শ্বস্থিত প্রাচীর ধরিয়া ফেলিলেন।

বিন্দুবাসিনী এ পর্য্যন্ত একটীও কথা ক'ন নাই এতক্ষণে কথা কহিলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে যে ধ্বনি বাহির হইল তাহা

যেন একটা স্বর্গের পিত্রে মহমায় সমস্ত ঘরখানা সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তিনি অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "এর জন্যে এত কথা বলবারতো কিছু দরকার ছিল না। শোভা আমার বৌ হবে,—আমার ঘরের লক্ষ্মী হয়ে আমার সংসারের মাঝখানে লক্ষ্মীর ঝাঁপি মাথায় করে বসবে, এ প্রলোভন আমি কি কোন দিন পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি! শোভা যে আমার সমস্ত প্রাণটা জুড়ে রয়েছে। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন। আজ যে ঘটনা ঘটলো এ ঘটনা যদি না ঘটতো তাহ'লে আজ কি আর আপনার পদধূলি আমার বাড়ীতে পড়তো। আপনি আমার বাড়ীতে এসেছেন,—শোভা আবার পুত্রবধূ হবে, এত আনন্দ যে ভগবান আমার জন্যে তুলে রেখেছিলেন তাতো আমি স্বপ্নেও একদিন ভাবতে পারিনি।"

জননীর কথাগুলি আজ প্রফুল্লনাথের নিকট যেন একটা ছন্দের মত,—স্বর্গীয় বার্ত্তার মত প্রকাশ পাইল। প্রাচীন কালের তপোবনের ঋষি কণ্ঠে সাম বেদের গানের মত তাহা যেন তাঁহার কর্ণের চারি পার্শ্বে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কাটা দিল। মুহূর্ত্তের জন্য তিনি যেন একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া একটী জ্যোতি লেখা সূক্ষ্ম মৃণালের ন্যায় উঠিয়া আবার একটী জ্যোতির্ম্ময়

শতদলের সহিত মিশিয়া সমস্ত বিশ্ব সংসারে পরিব্যপ্ত হইয়া একেবারে বিকশিত হইয়া পড়িল। তাহার সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি,—সমস্ত চেতনা ইহাতে যেন এক স্বর্গীয় আনন্দে একেবারে নিস্পেশিত হইয়া গেল। তাঁহার যৌবনের এক অংশের পর্দ্দা মুহূর্ত্তের জন্য একটা দমকা হাওয়ায় উড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই অংশের ভিতর পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া একেবারে একটা মায়া বিস্তার করিয়া দিল। প্রফুল্লনাথ যেন একেবারে পাষাণ হইয়া গেলেন। ভাবের আধিক্যে তাঁহার শ্বাস রুদ্ধ হইল। দুর্লভবাবু কিন্তু আর নীরব থাকিতে পারিলেন না,—বিন্দুবাসিনী কথার মাঝখানেই বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা তোমারই জিত্। অঘোর বোস যা কর্ত্তে পারেনি, আজ তুমি তাই কল্লে। এতদিনে দুর্লভ মিত্তিরের সম্পুর্ণ পরাজয় হ'লো। আমি আর দাঁড়াতে পারিনে, মা আজ রাত্রেই বিয়ে। বিয়েটা আমার বাড়ী থেকেই হবে। চল্লুম আমি তার জোগাড় করিগে।"

দুর্লভবাবু মহা ব্যস্ত ভাবে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে-ছিলেন,—দ্বারের নিকট গিয়া সহসা ফিরিলেন। হরিচরণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হরিচরণ আর তুমি মুখ কালো করে থেকো না,—শুভ কাজে আনন্দ কর। আমিও তোমাকে ছাড়ছিনে ;—তোমার ছোট মেয়ের সঙ্গে আমারও ছোট ছেলের

বিয়ে পাকা হয়ে গেল। আমরা তোমাকে মধ্যে রেখে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এমন বাধন দেব যে আমরা যেন তাতে করে পরস্পর পরস্পরের চিরদিনের মত আপনার হয়ে যাই।"

হরিচরণের বাক্যরোধ হইয়া গিয়াছিল;—তিনি একটীও কথা কহিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রাণের কৃতজ্ঞতা অশ্রু হইয়া গণ্ড বহিয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দুর্লভবাবু আর উত্তরের অপেক্ষা পর্য্যন্ত না রাখিয়াই তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিন্দুবাসিনী ধীরে ধীরে যাইয়া শোভার হস্ত ধরিলেন। অতি মৃদু স্বরে বলিলেন, "আয় মা আমার ঘরের-লক্ষ্মী, আয় মা আমার ঘরে আয়। আমার শূন্য সংসারের মাঝখানে বসে দে মা আমার সংসার আবার স্বর্গের আনন্দে ভরিয়ে দে।"

প্রফুল্লনাথ বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়াছিলেন। জননীর পার্শ্বে তিনি আজ শোভাকে আর এক নূতন মুর্ত্তিতে দেখিলেন। শোভা যেন আজ দশ-মহাবিদ্যা-রূপে হিন্দুর পবিত্র অন্তঃপুরে নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতেছে। তাহার নয়নে শান্তি,—বদনে হাসি, ললাটে দীপ্তি,—বক্ষে দয়া,—সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ভক্তি ও প্রীতি, স্নেহ ও মমতা ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রফুল্লনাথের নয়ন ফিরিল না,—সেই মূর্ত্তি যেন তাহার নয়ন ভেদ করিয়া একেবারে বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সমস্ত